সুখেঅসুখে
স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকাশনা
৭ম বর্ষ মে, ২০১৬ সংখ্যা ২৫

ডায়াবেটিসকে ভয়!
জয় করতে হয়...

ডায়াবেটিস চিকিৎসকদের জন্য

ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ

ইনসুলিন ইতিবৃত্ত

ডায়াবেটিস ও ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা

ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যায়াম

এক নজরে ডায়াবেটিস

[HOTLINE : 10606]

বন্ধ্যাত্ব শুধু নারীর সমস্যা নয়

পুরুষদেরও থাকতে পারে বন্ধ্যাত্বতা। ইন-ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (IVF)-এর মাধ্যমে নারী বা পুরুষ যে কারও বন্ধ্যাত্বকে জয় করে সন্তান পাওয়ার আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেন।

নিঃসন্তান দম্পতির স্বপ্ন পূরণে ...

বন্ধ্যাত্ব থেকে সন্তান ধারণ পর্যন্ত সব পর্যায়ের পরিপূর্ণ সুচিকিৎসার জন্য সুদক্ষ চিকিৎসকদল ও অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি নিয়ে

ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টার

ল্যাবএইড ফার্টিলিটি সেন্টার
...where blossoms your dream baby

বিস্তারিত জানতে : ০১৭৬৬৬৬০১৯৮

ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

বাড়ি ৬, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন: ৯৬৭৬৩৫৬, ৮৬১০৭৯৩-৮
ওয়েব: www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com

সূচিপত্র

৭ম বর্ষ মে, ২০১৬ সংখ্যা ২৫

	ডায়াবেটিস চিকিৎসকদের জন্য	৫
	ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ	৮
	ইনসুলিন ইতিবৃত্ত	১০
	ডায়াবেটিস ও ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা	১২
	ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যায়াম	১৪
	এক নজরে ডায়াবেটিস	১৬
	শিশুদের ডায়াবেটিস	১৭
	ডায়াবেটিসের কারণ ও প্রতিকার	১৯
	ডায়াবেটিসজনিত চক্ষু রোগ	২০
	ডায়াবেটিস এবং পায়ের যত্ন	২১
	ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ	২২
	ডায়াবেটিস রোগীর দাঁত ও মুখের যত্ন	২৪
	ডায়াবেটিক রোগীর চিনি স্বল্পতা	২৭

সুখে ও অসুখে

সুখে অসুখে

সম্পাদকীয়

বিশ্বজুড়ে আশঙ্কাজনক হারে ডায়াবেটিস রোগ বেড়ে চলছে। দুঃখের বিষয় বিরাট একটা জনগোষ্ঠী জানেই না, তারা ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন। অজ্ঞতায় অসাবধানতায় ডায়াবেটিসজনিত জটিলতাগুলো তাই প্রকট হয়ে উঠছে। শরীরের যে কোনো অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দিলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন, রক্তে গ্লুকোজ হ্রাসকারী ওষুধ ব্যবহার এবং নিয়মিত ব্যায়াম অত্যাবশ্যকীয়। মেনে নিতেই হবে শৃঙ্খলাই জীবন।

এবারের পুরো সংখ্যাটি ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সাজানো হয়েছে। ডায়াবেটিস নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা এবং সেগুলো ভেঙে দিতে বিশেষজ্ঞের দেয়া সঠিক তথ্যও আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি বিশ্বাস করি সংখ্যাটি আপনার পরিবারের প্রয়োজনে আসবে। সুখেঅসুখে ল্যাবএইড সব সময় আপনার সঙ্গে আছে।

সম্পাদক
ডা. এ এম শামীম

বাড়ি ১, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫ ফোন : 58610793-8, *ফ্যাক্স :* 88-02-9615497
ই-মেইল : info@labaidgroup.com, *ওয়েব* : www.labaidgroup.com

ডায়াবেটিস চিকিৎসকদের জন্য

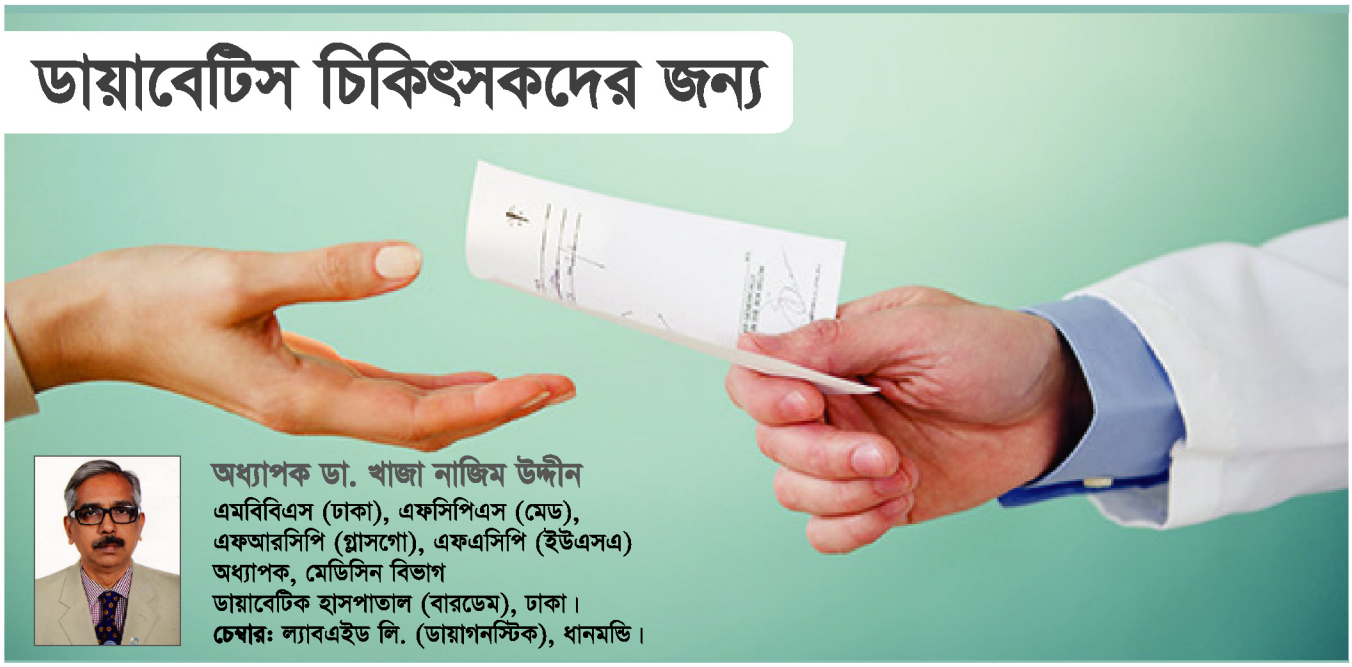

অধ্যাপক ডা. খাজা নাজিম উদ্দীন
এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (মেড),
এফআরসিপি (গ্লাসগো), এফএসিপি (ইউএসএ)
অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ
ডায়াবেটিক হাসপাতাল (বারডেম), ঢাকা।
চেম্বার: ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), ধানমন্ডি।

ভূমিকা

ডায়াবেটিস সিস্টেমিক ডিজিজ। বর্তমান পৃথিবীতে ৪০ কোটি লোকের ডায়াবটিস আছে।
যার ডায়াবেটিস নেই, যার উচ্চ রক্তচাপ নেই, তার আসলে কোনো রোগ নেই।

কখন ডায়াবেটিস খুঁজবেন

প্যারোনাইকিয়া হলে। মাসল ক্রাম্প থাকলে। অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিকানসন থাকলে। ৪৫ বছরের বেশি বয়স্ক যেকোনো লোকের রুটিন মেডিকেল চেকআপ করার সময়। বেশি ওজনের মানুষ বিশেষ করে দুটি রিস্ক ফ্যাক্টর (এশিয়ান, অ্যাকান্থোসিস, নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, হাইপারটেনশন) থাকলে। প্রেগনেন্সি ১২ সপ্তাহ হলে। মায়ের বেশি ওজনের বাচ্চা হলে (>৯ পাউন্ড)

রক্তের গ্লুকোজ পরীক্ষা করতে ভুললে চলবে না-

আলসার যখন সারে না, ঘা যখন শুকায় না। যখন ওজন কমার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দরকার। ন্যাশ থাকলে বা লিভার এনজাইম বেশি থাকলে। ডায়াবেটিসের উপসর্গ থাকলে। করটিকস্টেরয়েড, ডাইউরেটিক, সাইক্লোস্পরিন, মাইকোফেনলেট মফিয়েট এটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক জাতীয় ওষুধ খেলে।

স্বাভাবিক সুগার কত?

অভুক্ত অবস্থায় (আগে) <৬ মিমোল/লিঃ যেকোনো সময় (র‍্যান্ডম)-<৮মি. মোল/লি। এইচবিএ১সি-৫.৫%।

প্রি-ডায়াবেটিস : অভুক্ত-৬.১-৬.৯ মি. মোল!
খাওয়ার পর ৭.৯ থেকে ১১.০ মি. মোল

ডায়াবেটিস : অভুক্ত ৭ মি. মোল এবং তার বেশি। খাওয়ার পর ১১.১ মি. মোল এর বেশি।
এইচবিএ১সি ৬.৫% এর বেশি।
ঠিকমতো করা থাকলে যেকোনো একটা রিপোর্টই (কাট পয়েন্ট) ডায়াগনোসিস নিশ্চিত করবে।

কেন প্রি-ডায়াবেটিস

১। এদের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা তিন গুণ।
২। এদের ম্যাক্রোভাস্কুলারজটিলতা অর্থাৎ মোটা রক্তনালি, হার্ট ও ব্রেনের অসুখ বেশি হয়।
৩। এই স্টেজে গ্লুকোজ কন্ট্রোলে রাখতে পারলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কী করবেন

১। উপসর্গ নেই কিন্তু র‍্যান্ডম সুগার ১১.১ মি. মোল-রিপিট করতে হবে ওইদিন বা পরদিন দেরিতে নয়।
২। ফাস্টিং <৭ কিন্তু এ১সি > ৬.৫ -ডায়াগনোসিসনিশ্চিত।
৩। যদি দ্বিধা থাকে রিপিট করলে এ১সি দিয়ে নিশ্চিত হওয়ার চান্স বেশি।
৪। রিপোর্ট স্বাভাবিক হলে তিন বছরের মধ্যে রিপিট করতে হবে।
৫। প্রি-ডায়াবেটিস হলে এক বছরের মধ্যে রিপিট করতে হবে।

কী কাউন্সেলিং করবেন

ডায়াবেটিস যেকোনো সময় যেকোনো বয়সে যেকোনো লোকের হতে পারে। ডায়াবেটিস চিকিৎসা করে কন্ট্রোল করা যায়, কিউর করা যায় না। ডিসিপ্লিনড না হলে কন্ট্রোল করা যায় না। কন্ট্রোলে রাখতে পারলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন সম্ভব।

চিকিৎসা

তিনটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস-১। জীবনযাত্রার পরিবর্তন
২। ওষুধের ব্যবহার ও ৩। প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

লাইফ স্টাইল পরিবর্তন : খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে ও নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে হবে যেন ওজন স্বাভাবিক হয়। জীবনযাত্রার পরিবর্তন মানে অফিস সময় বদলানো নয় বা ঘুমের অভ্যাস বা দৈনন্দিন জীবন পাল্টিয়ে ফেলা নয়। ডায়াবেটিক রোগীকে ডিসিপ্লিনড হতে হবে। আসলে diabetes is a disease of discipline! একজনের জীবনযাত্রা ঠিক রেখেও ডিসিপ্লিনড হওয়া সম্ভব। স্থূলকায় লোকের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ বেশি। তাই ওজন স্বাভাবিক করতে হবে। উচ্চতা অনুযায়ী সবারই একটা ওজন বজায় রাখতে হয়, কায়িক শ্রম বা পেশা অনুযায়ী ক্যালরি বরাদ্দ ঠিক করতে হবে। এককথায় বললে জিহ্বা ছোট, পা লম্বা করতে হবে। অর্থাৎ হিসাব করে খেতে হবে ও শারীরিক পরিশ্রম বাড়াতে হবে। লক্ষ্য হবে প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে ৭ শতাংশ ওজন কমানো এবং ধরে রাখা। তবে ৫ শতাংশ কমাতে পারলেই গ্লাইসেমিক কন্ট্রোলের সুবিধা পাওয়া যায়।

ডায়াবেটিস রোগীর খাবার : ডায়াবেটিসের খাবার মানে সব কিছু বাদ দিতে হবে তা নয়; যা-ই খান যেভাবেই খান মোট ক্যালরি ঠিক রাখতে হবে। আসলে মিষ্টি ছাড়া সবই খাওয়া যাবে, তবে হিসাব করে খেতে হবে। অফিসের চা-কফিতে চিনি (হালকা চিনি! বলে কিছু নেই) খাওয়া হয়, কনডেন্সড মিল্ক খাওয়া হয়, এগুলোতে গ্লুকোজ বাড়ে, তাই বাদ দিতে হবে। প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেই বাছাই করে খেতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবারই ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও প্রতিকারের প্রধান উপায়। আপনি যে ধরনের খাবার খেয়ে অভ্যস্ত তাই খাবেন। তবে ওজন ঠিক রাখার জন্য ক্যালরি ঠিক করে নিতে হবে। তবে এটা ঠিক প্রেসার বেশি থাকলে পাতে লবণ খাওয়া যাবে না, চর্বি জাতীয় খাবার হিসাব করতে হবে। কিডনি রোগ হলে এক পানি ও আমিষ (০.৮ গ্রাম/ কেজি) হিসাব করে খেতে হয়। শরীরে শর্করার জন্য যে ইনসুলিন নিঃসরণ হয় প্রোটিন তা আরও বাড়ায়। মোট ক্যালরির ২০-৩৫ শতাংশ চর্বিজাতীয় খাবার হতে হবে, কোনো আপার লিমিট নেই। তবে পরিমাণ নয়, গুণ (যেমন মনোআনস্যচুরেটেড ফ্যাটি-এসিড গ্লাইসেমিয়া ও লিপিড কমায়) আসল লোগ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কার্বোহাইড্রেড ও ওমেগা৩ ফ্যাটি-এসিড গ্লুকোজ কন্ট্রোলে সাহায্য করে না। সবার জন্য পাতে অতিরিক্ত লবণ না খাওয়াই (১৫০০ গ্রাম/দিন) উত্তম।

কাদের ব্যায়াম করা ঠিক নয়: অটনমিক নিউরোপ্যাথি থাকলে ব্যায়ামের আগে কার্ডিয়াক ইভালুয়েশন, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি থাকলে পা পরীক্ষা, ওয়েট বিয়ারিং ব্যায়াম না করা ভালো। প্রলিফারিটিফ রেটিনপ্যাথি থাকলে চিকিৎসার আগে ব্যায়াম না করা ভালো। সিক্রেটগগও ইনসুলিন চিকিৎসা পাওয়া রোগীদের ব্লাড গ্লুকোজ ৬ মি. মোলের কম থাকলে ব্যায়ামের আগে কিছু শর্করাজাতীয় খাবার খেয়ে নেওয়া ভালো। কিডনির রোগীর ব্যায়ামের নিষেধ নেই।

ডায়াবেটিস না হলেও সবাইকে ধূমপান ছাড়তে বলতে হবে। কারণ ধূমপায়ী হলে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ব্যায়াম ওজন ঠিক রাখে, ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা ও সংবেদনশীলতা বাড়ায়। অনেকভাবেই ব্যায়াম করা যায়, তবে হাঁটাই সর্বোত্তম। আপনার ডায়াবেটিস আছে অথচ হাঁটবেন না তা হবে না, হতে পারে না। ব্যায়াম করতে পারলেই লাভ। প্রতিদিন কমপক্ষে ৪৫ মিনিট হাঁটুন। এমন হাঁটুন যাতে গা ঘামে, যাতে ক্ষুধা লাগে, যাতে পালস বাড়ে; যাতে মানুষ বোঝে আপনি ডায়াবেটিসের জন্য হাঁটছেন। সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট হাঁটতে হবে এটা তিন থেকে পাঁচ দিনে হতে পারে। তবে পর পর দুইদিন মিস করা যাবে না। সপ্তাহে দুই দিন রেজিস্ট্যান্স (মাসলস স্ট্রেংদেনিং, ফ্রি ওয়েট বা ওয়েট মেশিন) এক্সারসাইজ করা দরকার। বাচ্চাদের দিনে ৬০ মিনিট করা উচিত। শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে এক-চতুর্থাংশ মানুষের ডায়াবেটিস হয়। ৯০ মিনিটের বেশি একটানা বসে না থেকে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে থাকলে বা কিছুক্ষণ হাঁটলে উপকার হয়।

ডায়াবেটিস রোগীর প্রাসঙ্গিক সমস্যাসমূহ

ভ্যাক্সিন: ২৫ থেকে ৬৫ বছরের রোগীদের, যারা নিউমোনিয়ায় মারা যায় ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা অন্যদের তুলনায় ২.৫ গুণ, সবাইকে তাই নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিতে উৎসাহিত করতে হবে। হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন সবার জন্য অত্যাবশ্যক কারণ ট্রান্সমিশনের সমূহ সম্ভাবনা।

মানসিক রোগ : ডিপ্রেসনের সম্ভাবনা ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। ডায়াবেটিসের সঙ্গে ডিপ্রেসন থাকলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা দ্বিগুণ।

ডায়াবেটিস ডিস্ট্রেস (সবকিছুতেই নেগেটিভ/সিনড্রম অ্যাটিচুড হয়) ১৮ থেকে ৪৫ শতাংশের।

ফ্যাটি লিভার : অতিরিক্ত হেপাটিক ট্রান্সামাইনেস আসলে যাদের বিএমআই, ওয়েস্ট সারকামফারেন্স ও ট্রাইগি-সারাইড বেশি এবং এইচডিএল কম তাদের সবারই থাকে। ওজন কমালে, লিপিডের চিকিৎসা করলে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করলেই উপকার হয়। অন্য ওষুধ লাগে না। তবে স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৫ গুণ (১০০)-র বেশি হলে অন্য রোগ যেমন-ভাইরাল হেপাটাইটিস, অটইমুন হেপাটাইটিস, লুপাস হেপাটাইটিস, উইলসনস ডিজিস ইত্যাদির জন্য পরীক্ষা করতে হয়। এগুলো না হলে ট্যাবলেট দিয়েই চিকিৎসা করা যায়। ইনসুলিন আবশ্যক নয়। ডায়াবেটিক রোগীদের স্লিপ অ্যাপনিয়া (মোটা হলে ৪ থেকে ১০ গুণ), ক্যানসার (লিভার, প্যানক্রিয়াস,ব্লাডার), ফ্রাক্চার রিস্ক (বিশেষ করে গ্লিটাজন ও এসজিএল টি-২ ইনহিবিটর খেলে) কগনিটিভ (>৬০) ও হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট, পেরিওডন্টাল ডিজিস বেশি।

ডায়াবেটিসের ওষুধ

ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না হলে কী করতে হবে যদি এমন হয় যে একজন রোগী চার প্রকার ট্যাবলেট পায় বা ৬০/৭০ ইউনিট বা বেশি ইনসুলিন নেয় কিন্তু ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হয় না। প্রথমে মনে রাখতে হবে ডায়াবেটিস সেরে যায় না,

কিন্তু কন্ট্রোল করা যায় তাই কন্ট্রোল হতেই হবে। এসব ক্ষেত্রে হয় রোগীর দোষ, নয়তো ওষুধের দোষ। ডায়াবটিসের রোগী ডিসিপ্লিনড না হলে সমস্যা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, নিয়মিত ব্যায়াম করাটা জরুরি। আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মা/চাচি বা দাদি/নানিদের জন্য এটা ডিফিকাল্ট কিন্তু অসম্ভব নয়। শুধু অত্যাবশ্যকীয়তাটা উপলব্ধি করাতে হবে। ডায়াবেটিস হয়েছে হাঁটবেন না এটা অসম্ভব। ফজরের নামাজ পড়ে বা সকালের পূজা সেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হবে। ওই সময় শহর হোক, গ্রাম হোক রাস্তা ফাঁকা থাকে।

যারা পুরোনো ডায়াবেটিক রোগী তাদের অধিকাংশই মিষ্টি খান না। ভাত বা রুটির ব্যাপারে অনেকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে। বোঝাতে হবে যে আইটেম নয়, আসল হিসাব হলো ক্যালরিতে। ওজন ঠিক রাখার জন্য বা টোটাল ক্যালরি ঠিক রেখে খেতে হবে। এক্সচেঞ্জ ডায়েট সম্পর্কে ধারণা দিতে পারলে মেন্যুর একঘেয়েমি থাকবে না, যদিও ভাতে মাছে বাঙালি আমাদের এই জিনিসটা খুব একটা সমস্যা করে করে না।

যারা ট্যাবলেট খান তাদের ম্যাক্সিমাম ডোজ সম্পর্কে ধারণা না থাকায়, ইনসুলিনের ভয়ে অনেকে অতিরিক্ত ডোজে গ্লিক্লাজাইড, গ্লিপিজাইড, গ্লিম্পারাইড খায়। রোগী ও প্র্যাক্টিশনারদের তাই সেকেন্ডারি ফেইলর, কখন ইনসুলিন দিতেই হবে (A1C>9) ইত্যাদি ব্যাপারে ধারণা থাকতে হবে।

যারা ইনসুলিন নেয় ডিভাইসগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। অনেকেই মনে করে একবার শুরু করলে ইনসুলিন ছাড়া যায় না, অনেকে ভাবেন এটাই শেষ চিকিৎসা। ইনসুলিন শুরু করার আগে তাই রোগীর কাউন্সেলিং দরকার, ইনসুলিন ও ডিভাইস সম্পর্কে ট্রেইনিং দেওয়া উচিত। যখন কন্ট্রোল হচ্ছে না ম্যাক্সিমাম ডোজ ট্যাবলেট খাওয়ার পর, কমপ্লায়েন্স ঠিক থাকলে স্বভাবতই ইনসুলিন দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠে। অনুসন্ধিৎস্যু হলে দেখবেন একই জায়গায় নিতে নিতে চামড়া মোটা হয়ে গেছে। মোটা চামড়ায় দিলে ওষুধ ঢোকে না। চামড়া মৌচাকের মতো হয়ে গেছে। রোগীকে ইনসুলিন দেওয়ার জায়গাগুলো চিনিয়ে দিতে হবে। চামড়াটা মোটা করে ধরে সূঁচ খাঁড়াভাবে পুশ করতে হবে যেন চামড়ার নিচে (সাব কিউটেনিয়াস) যায়, চামড়ার মধ্যে ইন্ট্রাকিউটেনিয়াস নয়।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া

ডায়াবেটিসের যেকোনো ওষুধেই হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্লুকোজ বেশি হলে কী হবে শুধু এটা বললেই হবে না। ওষুধ শুরু করার সময় তাই হাইপোগ্লাইসেমিয়া সম্পর্কেও রোগীকে ধারণা দিতে হবে।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া তাৎক্ষণিক চিকিৎসা জরুরি এবং সব ডায়াবেটিক রোগীরই এটা সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। ডায়াবেটিসের ওষুধ না খেলে ডায়াবেটিকের রোগীর হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় না। হাইপোগ্লাইসেমিয়া দুই রকম। এক. স্বল্প মাত্রা: যেটা রোগী নিজে চিকিৎসা করতে পারে, অন্যের সাহায্য লাগে না। দুই. মারাত্মক : অজ্ঞান হয়ে যায়। দশ মিনিট দেরি করলে ব্রেইন ড্যামেজ হতে পারে। অন্যের সাহায্য ছাড়া হয় না। গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে হবে। ১৫ মিনিট পর পর গ্লুকোজ পরীক্ষা করতে হবে। স্বাভাবকি হলে মুখে শর্করাসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে। সালফোনরিয়া ও লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন থেকে হলে দুইদিন অবজারভেশনে রাখতে হবে। আট ঘণ্টা পর পর রক্তে গ্লুকোজ পরীক্ষা করতে হবে। দুটি স্যাম্পলে গ্লুকোজ ১০ মি. মোলের বেশি হলে ডায়াবেটিসের ওষুধ শুরু করতে হবে। শর্ট/রাপিড অ্যাক্টিং ইনসুলি দিয়ে শুরু করতে হবে কমপক্ষে (৬+০+৪) ডোজ দিয়ে। সালোফনিলুরিয়া এক বা ততোধিক ট্যাবলেট থেকে হলে এক-চতুর্থাংশ দিয়ে শুরু করে দিতে হবে।

শেষ কথা : ডায়াবেটিস একটা মহামারি। সবাইকে এটা জানতে হবে। নিয়ন্ত্রনে থাকলে স্বভাবিক জীবন সম্ভব। ডয়াবেটিস আপনাকে নিয়ন্ত্রন করার আগে আপনি ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রন করুন।

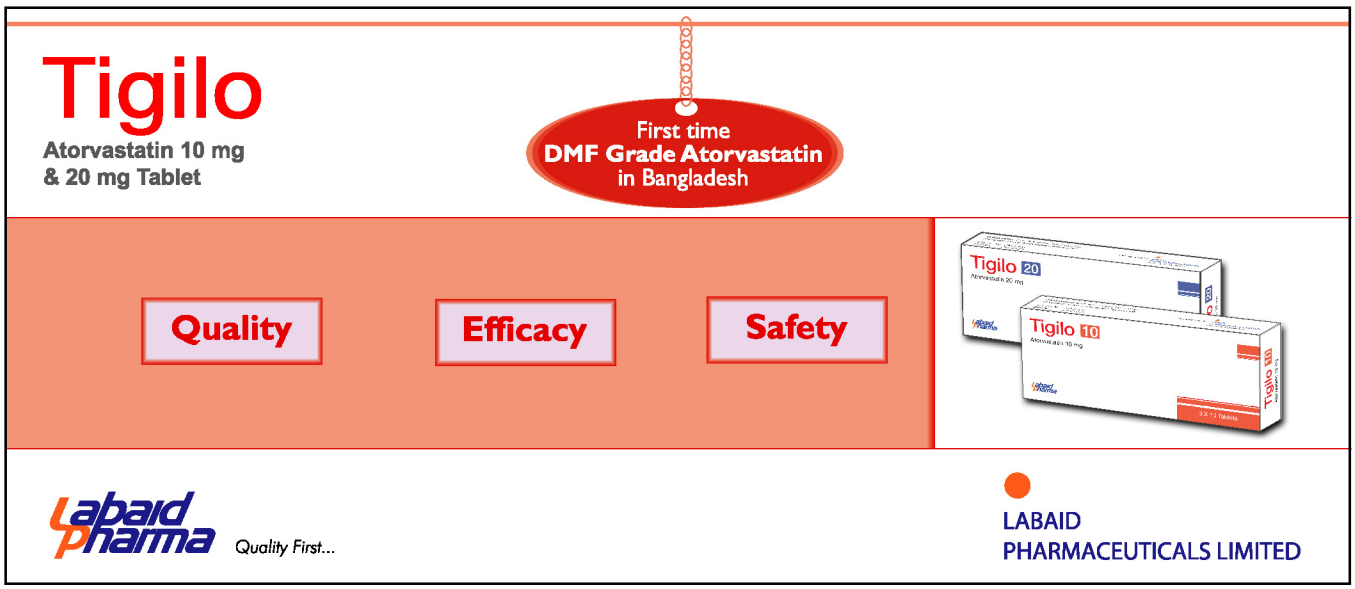

ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ

ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং প্রতিকার

অধ্যাপক (ডাঃ) এম. এম. জহুরুল আলম খাঁন

এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক, কার্ডিওলজি বিভাগ, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল
চেম্বার : ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল, ঢাকা।

কথায় বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা', ঠিক তেমনি ডায়াবেটিসে ছুঁলে অর্থাৎ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে শরীরে নানা রকম রোগ বাসা বাঁধে, সেই সঙ্গে বাড়ে রোগের ঝুঁকি। দেখা গেছে, যাদের ডায়াবেটিস নেই, তাদের তুলনায় যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের মৃত্যুহার দ্বিগুণ এবং গড় আয়ু ৫ থেকে ১০ বছর কম। ডায়াবেটিক রোগীদের অতিরিক্ত মৃত্যুহারের জন্য হৃদরোগও অনেকাংশে দায়ী, তবে অন্যান্য জটিলতার কারণেও রোগীর মৃত্যু হয়। ডায়াবেটিস দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার ঝুঁকি বেড়ে যায়, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয়। ডায়াবেটিসের দীর্ঘমেয়াদি জটিলতাগুলোকে মূলত দুভাগে ভাগ করা হয়–

১। মাইক্রোভাসকুলার (ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র রক্তনালির সমস্যা)
- ক) রেটিনোপ্যাথি (চোখের সমস্যা)
- খ) নেফ্রোপ্যাথি (বৃক্কের সমস্যা)
- গ) নিউরোপ্যাথি (স্নায়ুর সমস্যা)

২। ম্যাক্রোভাসকুলার (ক্ষুদ্র ও মধ্যম রক্তনালির সমস্যা)
- ক) হৃৎপিন্ডের করোনারি ধমনির রোগ (হৃদরোগ)
- খ) মস্তিষ্কের ধমনির রোগ স্ট্রোক
- গ) প্রান্তিক রক্তনালির রোগ

এসব জটিলতা কখন হবে, কী মাত্রায় হবে, এ সবই কতগুলো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যেমন–

- ক) ডায়াবেটিসের সময়সীমা
- খ) উচ্চ রক্তচাপ
- গ) রক্তে অতিরিক্ত চর্বি
- ঘ) ধূমপান
- ঙ) অতিরিক্ত ওজন
- চ) অলস জীবনযাপন

নন-ডায়াবেটিক রোগীর তুলনায় ডায়াবেটিক রোগীর বিভিন্ন ধরনের জটিলতার ঝুঁকি কতটুকু তা নিচে দেওয়া হলো –

তুলনামূলক ঝুঁকি (Relative Risk)

১। অন্ধত্ব	– ২০ শতাংশ
২। কিডনি ফেইলিওর	– ২৫ শতাংশ
৩। অ্যাম্পুটেশন/অঙ্গচ্ছেদ	– ৪০ শতাংশ
৪। হার্ট অ্যাটাক	– ২ থেকে ৫ শতাংশ
৫। স্ট্রোক	– ২ থেকে ৩ শতাংশ

যেহেতু সমস্যা জটিল, অতএব সমাধানের চেয়ে প্রতিরোধের দিকেই আমাদের বেশি জোর দিতে হবে। আর ডায়াবেটিস যদি কারও হয়েই যায় তবে লক্ষ রাখতে হবে, ডায়াবেটিস নিয়েও

ছবিতে দেখুন হার্ট সুস্থ রাখার উপায়

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে

স্বাস্থকর ফল সেবন করতে হবে

নিয়মিত শরীর চর্চা করতে হবে

ধুমপান পরিহার করতে হবে

যাতে দীর্ঘদিন স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা যায়, জটিলতাগুলোকে যতদূর সম্ভব এড়ানো যায়। অন্তত দ্রুত যাতে শরীর খারাপ না হয়, কোনো ধরনের জটিলতা না হয় সে চেষ্টা করতে হবে।

যেহেতু ডায়াবেটিক রোগীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং ডায়াবেটিক রোগীদের অতিরিক্ত মৃত্যুহারের জন্য হৃদরোগও দায়ী। সে জন্য যে সব অভ্যাস ও জীবনযাপনের পদ্ধতি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, তা পরিহার করতে হবে। যে সব পদ্ধতিতে হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো যায়, তার কিছু পরামর্শ নিচে দেওয়া হলো।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখুন

আপনার রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখলে আপনার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যাবে, নিয়মিত ব্যায়াম ও নিয়ন্ত্রিত খাবার রক্তের শর্করা স্বাভাবিক রাখে। খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম ও ওষুধ রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করছে কি না এটা দেখার জন্য নিয়মিত রক্তের শর্করা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। প্রয়োজনে কোনো কোনো রোগীকে ওষুধ ব্যবহার করে রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ওজন কমান ও হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন

অতিরিক্ত ওজন, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ প্রায়ই একসঙ্গে থাকে। আপনি যদি অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখেন তাহলে অনেক সমস্যা সহজেই দূর হবে। উদাহরণস্বরূপ ওজন কমানোর সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসে। রক্তের শর্করা যখন নিয়ন্ত্রণে থাকে না, তখন দেখা যায় যে, ওজন কমানোর সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। কোমর ও পেটে অতিরিক্ত মেদ হলে তা অবশ্যই কমানো দরকার। অতিরিক্ত ওজন যতটুকু কমানো যায় ততই মঙ্গল। তাতেও অনেক উপহার হবে। এমনকি কয়েক কেজি ওজন কমালেও হৃদরোগের অনেক উপহার হবে।

আপনার কোলেস্টেরল কমান

অনেক তেল ও চর্বিতে কোলেস্টেরল থাকে। কোলেস্টেরল কিন্তু চর্বি নয়। এটা হরমোনসহ শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের যেমন স্নায়ু ও স্নায়ুতন্ত্রের অংশ। তবে রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল রক্তনালি বন্ধ করে দিতে পারে। অনেকেই হয়তো ভালো বা মন্দ কোলেস্টেরলের কথা শুনেছেন। মন্দ বা এলডিএল (লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন) কোলেস্টেরল (আপনার) রক্তনালি বন্ধ করে দিয়ে হৃদরোগের কারণ ঘটায়। ভালো কোলেস্টেরল বা এইচডিএল (হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন) কোলেস্টেরল অতিরিক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় কোলেস্টেরলকে অপসারণ করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

যদি আপনার ডাক্তার বলে, আপনার রক্তে কোলেস্টেরল বেশি আছে, তখন আপনি কী করবেন? তখন আপনার কাজ হবে অতিরিক্ত ওজন কমানো এবং অ্যানার্জিবহুল ও চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার করা। আপনার খাবারের তালিকা থেকে চর্বিযুক্ত এবং কোলেস্টেরলসমৃদ্ধ খাবার কমিয়ে ফেলা। এ ব্যাপারে আপনি আপনার ডাক্তার বা পুষ্টিবিদের সাহায্য নিতে পারেন। যদি সঠিক পথ্যের মাধ্যমে কোলেস্টেরল কমাতে না পারেন, তখন ওষুধের সাহায্য নিতে হবে। সব সময় আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধ ঠিক করবেন। কোন ওষুধ আপনার জন্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে, তা আপনার শরীরের প্রয়োজন ও স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করবে।

দৈনিক বা কায়িক কাজকর্ম বাড়ান

পথ্যের পাশাপাশি ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পথ্য ও ব্যায়াম একত্রে আপনার শারীরিক কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক রাখবে। ওজন কমানোর উপযোগী পথ্যের সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম আপনার ওজন তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনবে। ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করুন, কতটুকু ব্যায়াম করবেন বা কতটুকু ব্যায়াম আপনার জন্য নিরাপদ। ব্যয়বহুল ব্যায়ামের কোনো প্রয়োজন নেই। জোরে হাঁটাই আপনার জন্য একটি উত্তম ব্যায়াম হতে পারে। আপনি লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে পারেন, যা আপনার ব্যায়ামের অংশ হতে পারে। স্বাস্থ্যসম্মত ও নিয়ন্ত্রিত খাবারের মতো ব্যায়াম আপনার রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাবে।

আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ডায়াবেটিক রোগীদের উচ্চ রক্তচাপ থাকে, উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগের জন্যে বিরাট ঝুঁকি। যে সব ব্যবস্থা নিলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আসে যেসব ব্যবস্থা উচ্চ রক্তচাপ কমাতেও সাহায্য করে। ওজন কমানো এবং ব্যায়ামের ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যত ওজন কমাবেন আপনার রক্তচাপ তত ভালো থাকবে। যারা মদ্যপান করেন তাদেরকে মদ্যপানের নেশা থেকে বিরত থাকতে হবে।

সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং ব্যায়াম সত্ত্বেও আপনার উচ্চ রক্তচাপ না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খান। মনে রাখবেন, আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে তবে আপনাকে রক্তচাপ অবশ্যই পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে।

ধূমপান করলে এখনই বন্ধ করুন

ধূমপান সবার জন্যই ক্ষতিকর। তবে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্যে বেশি ক্ষতিকর। কারণ ধূমপান ডায়াবেটিক রোগীদের রক্তনালির যথেষ্ট ক্ষতি করে। কোনো ডায়াবেটিক রোগী ধূমপান করলে তার হৃদরোগের সম্ভাবনা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। ধূমপান বন্ধ না করে ওজন কমালেও আপনার হৃদরোগের সম্ভাবনা থেকে যাবে। কাজেই ধূমপান বন্ধ করুন এবং নিয়মিত ব্যায়াম করুন। নিয়মিত ব্যায়াম না করলে আপনি আপনার কাঙ্খিত ওজনও কমাতে পারবেন না।

মনে রাখুন

ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার ডায়াবেটিক রোগীদের সাধারণত অতিরিক্ত ওজন ও উচ্চ রক্তচাপ থাকে। নিয়ন্ত্রিত পথ্য ও ব্যায়াম আপনার রক্তের শর্করা, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। হৃদরোগের ঝুঁকিও কমাবে। যখন সঠিক পথ্য, সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও ব্যায়াম সত্ত্বেও রক্তের শর্করা কোলেস্টেরল ও উচ্চ রক্তচাপ কমবে না, তখন ওষুধের সাহায্য নিতে হবে।

ইনসুলিন ইতিবৃত্ত

ডাঃ মোঃ ফিরোজ আমিন
এমবিবিএস, এমডি (এন্ডোক্রাইনোলজি)
এফএসিই (ইউএসএ)
ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞ
সহযোগী অধ্যাপক, হরমোন বিভাগ, বারডেম হাসপাতাল
চেম্বারঃ ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল

ইনসুলিন আবিষ্কৃত হবার আগে ডায়াবেটিস রোগীরা খুব অল্প বয়সেই মারা যেতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয়, ডায়াবেটিক রোগীর ইনসুলিন ঘাটতি থাকে আর সেটির উৎস পরিপাকরস নিঃসরণকারী গ্লান্ড 'প্যানক্রিয়াস'। পরবর্তিতে প্যানক্রিয়াস নিঃসৃত পদার্থটি নিয়ে গবেষণা চলে বিস্তর কিন্তু সফলতা আসে না। পরবর্তীতে কার্যকর সমাধানটি দেন দুই চিকিৎসাবিদ, ফ্রেডেরিক ব্যান্টিং এবং চার্লস বেস্ট। ১৯২১ সালে ইনসুলিন আবিষ্কার করতে তারা পুরোপুরি সক্ষম হন। লিওনার্ড থমসন প্রথম ডায়াবেটিস রোগী যাকে ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা শুরু হয়। এবার ডায়াবেটিস আর মারাত্মক রোগ নয়, নিয়ন্ত্রনযোগ্য রোগ হিসেবে গন্য হতে থাকে।

গবেষণায় দেখো গেছে, শুধু ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা অথবা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করাটাই মূখ্য নয়। রোগীর রক্তের সুগারের মাত্রা সারাদিন নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা, সেটা খুবই জরুরি। অর্থাৎ খালি পেটে/দুপুরের খাওয়ার আগে/ রাতে খাওয়ার আগে ৬-৭ মিলিমোল/লিঃ এবং সকাল ও রাতে খাওয়ার পর ৮-১০ মিলিমোল/লিঃ রাখতে হবে। গড় ডায়াবেটিস $HBA1_C$ ৭% এর নিচে থাকবে। শুধু তাই নয় যত তাড়াতাড়ি ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা যাবে, তত বেশি প্যানক্রিয়াসকেসুস্থ ও নিরাপদ রাখার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সঙ্গে বিটা সেলকে ধ্বংস হওয়া থেকেও রক্ষা করা যায়। ইনসুলিনের মাধ্যমে রক্তের শর্করা সহজে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, যেটি ট্যাবলেটের মাধ্যমে কষ্টসাধ্য। একটা ভুল ধারণা প্রচলিত আছে ডায়াবেটিস রোগীর ইনসুলিনই শেষ চিকিৎসা। সত্যিটা হলো, ডায়াবেটিক রোগীর জন্য ইনসুলিন শেষ চিকিৎসা নয়, বরং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা।

বিভিন্ন ধরনের ইনসুলিন বাজারে পাওয়া যায়। রাসায়নিক গঠনের উপর ভিত্তিকরে কোনটিকে স্বল্পমেয়াদি, মাঝারি আবার কোনোটিকে দীর্ঘমেয়াদি করে তৈরি করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য সারা দিনের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা। এসব ইনসুলিন রোগীর সঙ্গে আলোচনা করে তার জন্য উপযোগী নির্দিষ্ট মাত্রা, দিনে দুই, তিন ও চারবার আবার অনেক ক্ষেত্রে দুই ধরনের ইনসুলিনই মিলিয়ে দেয়া হয়।

স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেহে দুই ধরনের ইনসুলিন নিঃসরিত হয়। অভুক্ত অবস্থায় শরীরের নিজস্ব যে গ্লুকোজ তৈরি হয়, সেই গ্লুকোজকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সারা দিন অভুক্ত থাকলেও এক ধরনের ইনসুলিন নিঃসরিত হবে। এই ইনসুলিনকে বলা হয় বেসাল ইনসুলিন। আবার আমরা যখন খাবার খাই, সেটি যে খাবারই হোক, যে পরিমাণই হোক, শরীরে সেই খাবার গ্লুকোজ হিসেবেই জমা হয়। খাওয়ার পর সে গ্লুকোজ রক্তে আসে, তাকে নিয়ন্ত্রণের

জন্য প্যানক্রিয়াস থেকে আরেকভাবে ইনসুলিন নিঃসরিত হয়। এই ইনসুলিনকে বলা হয় বোলাস ইনসুলিন, যা খাবারের পরের গ্লুকোজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

একজন সুস্থ মানুষের দেহে এ দুই ধরনের ইনসুলিন সঠিক মাত্রায় তৈরি হলেও ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে এর ঘাটতি দেখা দেয়, যার ফলে তাদের শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এই নতুন ধারণাকে মাথায় রেখে ইনসুলিন সরবরাহের ক্ষেত্রে নতুন করে ইনসুলিন মলিকিউল তৈরি করা হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে এই ধরনের ইনসুলিন এখন পাওয়া যাচ্ছে।

এই ইনসুলিন সারা দিনে একবার গ্রহণ করে ২৪ ঘণ্টায় আমাদের শরীরে অভুক্ত অবস্থায় যে পরিমাণ ইনসুলিনের প্রয়োজন, তার ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। তবে এটা দিয়ে খাবারের পর যে শর্করা তৈরি হয়, সেটা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে খাওয়ার পর রক্তের বাড়তি শর্করা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ইনসুলিন (বোলাস ইনসুলিন) দরকার, তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যেটা আগের ইনসুলিন দিয়ে সম্ভব ছিল না; এটাই হলো বোলাস ইনসুলিনের কার্যকারিতা, যার ফলে সঠিকভাবে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং রক্তে শর্করার স্বল্পতা অর্থাৎ হাইপোগ্লাইসেমিয়া এড়ানো সম্ভব।

এখন আমরা যদি একই সঙ্গে বেসাল ও বোলাস ইনসুলিন ব্যবহার করি, তাহলে অভুক্ত অবস্থায় এবং খাওয়ার পরে শরীরে ইনসুলিন সরবরাহ সুস্থ মানুষের মতো সঠিকভাবে করা সম্ভব। ফলে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা থেকে খুব সহজেই ভালো থাকা সম্ভব। সমস্যা হচ্ছে, বোলাস ও বেসাল ইনসুলিন রোগীদের ৪ বার নিতে হয়। এতে অনেকে অনীহা প্রকাশ করে। তাই দুইবার ইনসুলিন দিয়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থ হয়।

জেনে রাখুন অসুস্থ হলেও সময় মতো ইনসুলিন নিতে হবে। হয়তো ডোজ কম লাগবে কারো কারো। কারণ, আমাদের শরীরে যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিছু হরমোন তৈরি হয় যা রক্তে শর্করা বাড়িয়ে দিতে পারে। ইনসুলিনের অভাবে একদিকে কাজ শর্করা শরীরের কাজে লাগে না, অপরদিকে তাপ ও শক্তির জন্য দেহের সঞ্চিত চর্বি অতিরিক্ত ভেঙ্গে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ যেমন কিটন বডি বেশি মাত্রায় রক্তে বেড়ে যায়। ফলে রোগী অজ্ঞান হয়েও যেতে পারে। এই অবস্থাকে ডায়াবেটিস কিটোএসিডোসিস বলে।

আসলে ইনসুলিন, ডায়াবেটিস রোগীর একটা অধিকার। ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা মেটানো যেমন অধিকার সেরকম ডায়াবেটিস রোগীর রক্তের গ্লুকোজ বেশী থাকলে ইনসুলিন দিয়ে তা কমানো, রোগীর ভালো থাকাটা একটা অধিকার।

নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজ পরীক্ষা

যাদের পক্ষে সম্ভব তারা অবশ্যই গ্লুকোমিটার কিনে নিবেন। প্রতিদিন সম্ভব না হলে সপ্তাহে একদিন অবশ্যই রক্তের গ্লুকোজ নিজের মেশিনে চেক করে নিবেন। রক্তের এই পরীক্ষা দিনের বিভিন্ন সময়ে করতে হবে (খালি পেটে, নাস্তার ২ ঘণ্টা পর দুপুরের খাওয়ার আগে ও পরে, রাতে খাওয়ার আগে ও পরে) খাবার অবশ্যই পরিমিত খাবেন (খাদ্য তালিকা অনুযায়ী) এবং অল্প অল্প করে ৩ ঘণ্টা পর পর খেতে হবে। (৮টা, ১১টা, ২টা, ৫টা, ৯টা এবং রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই কিছু খেয়ে শুবেন। নিয়মিত ব্যায়াম ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ওষুধ খাওয়ার পরও যদি একজন রোগীর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি থাকে অথবা $HBA1_C$ ৭% এর বেশি থাকে তবে বুঝতে হবে শরীরে ইনসুলিন তৈরির ক্ষমতা কমে যাচ্ছে অথবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইনসুলিন শুরু করতে হবে। নতুন অবস্থায় অথবা হঠাৎ করে রক্তের গ্লুকোজ কোন কারণে বেড়ে গেলে ইনসুলিন নিয়ে গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে হবে। ইনসুলিন নিতে প্রত্যেক রোগীই ভয় পায়। শরীর ভাল রাখতে হলে ইনসুলিন নিয়েই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শরীর ভাল থাকলে, মন ভাল থাকে, কাজ কর্মে দক্ষতা বাড়ে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে যা মনে রাখা খুবই জরুরি

- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রাঃ

সকাল		দুপুর	রাত
খালি পেটে	খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর	খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর	খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর
৫-৬ মিলিমোল/লিঃ	৭-৮ মিলিমোল/লিঃ	৭-৮ মিলিমোল/লিঃ	৭-৮ মিলিমোল/লিঃ

- তিন মাসে গড় ডায়াবেটিস ($HBA1_C$) ৭% এর নিচে রাখতে হবে।
- রক্ত চাপ ১৩০/৮০ এর নিচে থাকতে হবে।
- অবশ্যই রক্তের চর্বি (Chol, TG, HDL, LDL) লক্ষ্যমাত্রার নিচে রাখতে হবে।

রোগীরা অনেক সময় ইনসুলিন নিতে চায় না, ডাক্তার হিসাবে আমাদের তাতে সাড়া না দিয়ে বরং বুঝিয়ে শুরু করা উচিত। উচ্চতা অনুযায়ী ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটবেন। এমনভাবে হাঁটতে হবে যাতে আপনার হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। হাঁটা শুরুর আগে ৫-১০ মিনিট শরীর গরম (Warm-Up) করে নিবেন এবং ৩০ মিনিট জোরে হাঁটার পর আবার ধীরে ধীরে হেঁটে শরীর ঠান্ডা (Cool down) করে নিবেন। হাঁটতে যাওয়ার আগে পানি খেয়ে নিবেন।

আর, অসুস্থকালীন দিনগুলোতেও ইনসুলিন নেয়া বন্ধ করা যাবে না বরং ক্ষেত্রবিশেষে অধিক মাত্রায় ইনসুলিনেরও দরকার হতে পারে। ইনসুলিনের মাত্রা নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। সুখে থাকুন, অসুখে নয়।

ডায়াবেটিস ও ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা

ডা. ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ

এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (এন্ডোক্রাইনোলজি-বারডেম), এমএসিই (আমেরিকা)
ফেলো, আমেরিকান কলেজ অব এন্ডোক্রাইনোলজি
ট্রেইনিং ইন অ্যাডভান্সড এন্ডোক্রাইনোলজি (সিঙ্গাপুর)
মেডিসিন, ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোনরোগ বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক (ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রাইনোলজি)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ধানমন্ডি।

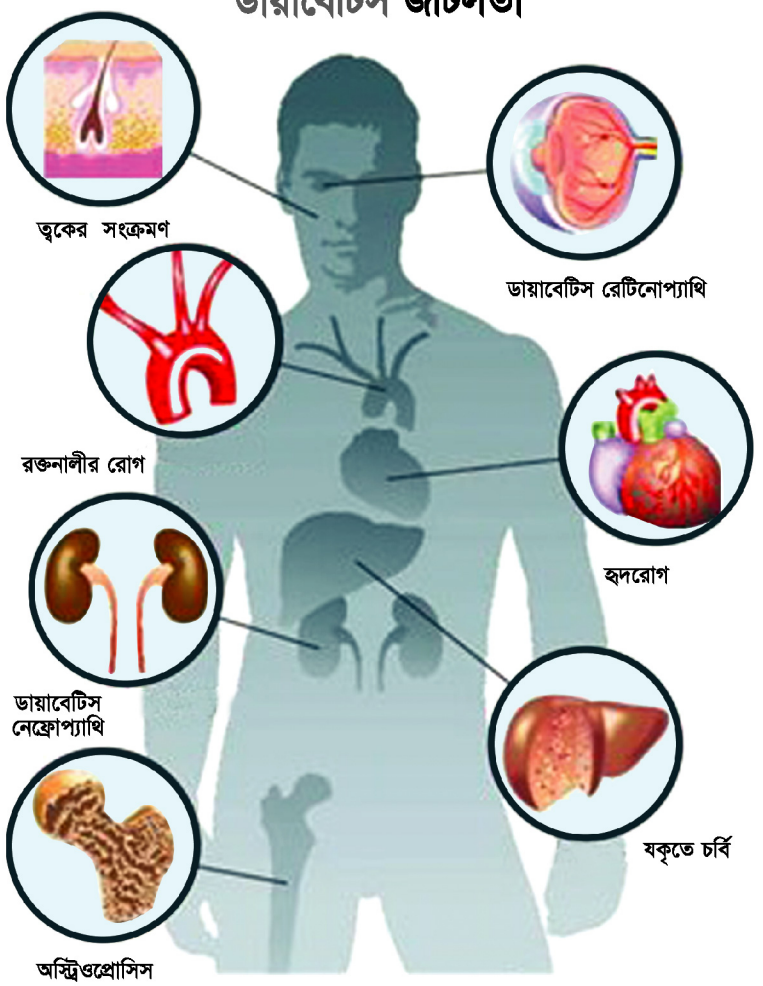

ডায়াবেটিস রোগটি আশঙ্কাজনক হারে আমাদের দেশে বেড়ে চলেছে। বিশ্বজুড়ে প্রতি ঘণ্টায় চার হাজার ১০০ জন মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে, প্রতি ঘণ্টায় ৬০০ জন মানুষ সরাসরি ডায়াবেটিস ও এর জটিলতার কারণে মারা যাচ্ছে। ২০৩ জন মানুষ প্রতি ঘণ্টায় পা হারাচ্ছে। ১২০ জনের কিডনি বিকল হচ্ছে। ৫৫ জন মানুষ প্রতি ঘণ্টায় অন্ধত্ব বরণ করছে।

দুর্ভাগ্যর বিষয় হলো, যাদের ডায়াবেটিস আছে তার অর্ধেকের বেশি জানে না যে, তারা এই রোগে ভুগছে। ফলে অনেকটা নীরবেই অধিকাংশ মানুষের ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা শুরু হয়ে যায়। ডায়াবেটিসের চিকিৎসা খুব ব্যয়বহুল নয় কিন্তু এর জটিলতার চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আমাদের মতো নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের মানুষের পক্ষে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতার চিকিৎসা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং দেশের অর্থনীতি ভীষণ চাপের মধ্যে পড়ে। কারণ এসব জটিলতায় উপার্জনশীল ব্যক্তি অক্ষম হয়ে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদি জটিলতাসমূহ ধীরে ধীরে মানবদেহে গভীর হতে যাচ্ছে। ডায়াবেটিসের সময়কাল যত দীর্ঘ হবে এবং যত অনিয়ন্ত্রিত থাকে জটিলতা তত বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সর্বোপরি ডায়াবেটিসের জটিলতা মানুষকে পঙ্গু করে দিতে পারে, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। সম্ভাব্য জটিলতাগুলো অনেকটা নিম্নরূপ–

হৃদরোগ ও রক্তনালির জটিলতা

ডায়াবেটিস নাটকীয়ভাবে হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালির বিভিন্ন সমস্যা ডেকে নিয়ে আসে, যেমন– হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে ব্লক ও বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, পায়ের রক্তনালি সরু হয়ে পায়ে ঘা দেখা দেয় অবশেষে পঙ্গুত্ব বরণ।

চামড়ার জটিলতা

ফাংগাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ ডায়াবেটিস রোগীদের চামড়ায় খুবই ঘন ঘন দেখা যায়।

কিডনি বিকল

কিডনির ভেতর লাখ লাখ সরু রক্তনালি থাকে (গ্লোমেরুলাই) যা রক্তের ভেতর জমতে থাকা বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করে। ডায়াবেটিস এই সূক্ষ্ম ছাঁকনিকে নষ্ট করতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতির ফলে কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত ডায়ালাইসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপনের মতো ব্যয়বহুল ও জটিল চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

পায়ের জটিলতা

পায়ের স্নায়ু দুর্বল হওয়া ও পায়ে রক্তনালি সরু হওয়ায় পায়ে নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা না করলে কাটা বা ফোসকা পড়া সহজে শুকাতে চায় না। ফলে পায়ে ইনফেকশন বা জীবাণুর সংক্রমণের জন্য আঙুল বা কখনো পা কাটার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে।

চোখের ক্ষতি (রেটিনোপ্যাথি)

ডায়াবেটিস চোখের রেটিনার রক্তনালির ক্ষতি করতে পারে। দিনের পর দিন ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে চোখে ছানি পড়া (ক্যাটারেক্ট) চোখের প্রেসার বেড়ে যাওয়া (গ্লুকোমা) এবং রেটিনোপ্যাথির কারণে চোখ অন্ধ হতে পারে।

বাচ্চার মৃত্যু

চিকিৎসাবিহীন থাকলে গর্ভকালীন ডায়াবেটিস মায়েদের বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার আগে অথবা ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই মারা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হওয়া

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস মায়েদের বাচ্চা পরবর্তীতে অতিরিক্ত মোটা ও এমনকি টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের জটিলতা

বেশিরভাগ গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মা সুস্থ বাচ্চা প্রসব করেন। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস মা ও বাচ্চা উভয়েরই সমস্যা তৈরি করতে পারে।

মায়ের জটিলতা

প্রি এক্লাম্পশিয়া: লক্ষণসমূহ হচ্ছে অতিরিক্ত রক্তচাপ, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন, পায়ে পানি ইত্যাদি। প্রি এক্লাম্পশিয়া হলে বাচ্চা ও মা উভয়েরই মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

বাচ্চার জটিলতা

অতিরিক্ত বড় বাচ্চা : মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ গর্ভফুল ভেদ করতে পারে বা বাচ্চার অগ্নাশয় উত্তেজিত করে অতিরিক্ত ইনসুলিন তৈরি করাতে পারে যার ফলে বাচ্চার ওজন অস্বাভাবিক বেশি হতে পারে (ম্যাক্রোসেজিরা)।

পরবর্তী গর্ভধারণে আবারও ডায়াবেটিস

একবার গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হলে পরবর্তী গর্ভধারণে আবারও গর্ভকালীন ডায়াবেটিস হতে পারে। বয়সের সঙ্গে পরবর্তীতে টাইপ-২ ডায়াবেটিস দেখা দিতে পারে।

স্নায়ু বা নার্ভের ক্ষতি

অতিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস কিছু সূক্ষ্ম রক্তনালি যা কিনা স্নায়ুকে পুষ্টি দেয়। ফলে জ্বালাপোড়া, ঝিম ঝিম, ব্যাথা ও অবশভাব যা পায়ে আঙুল থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এরপরেও যদি সুচিকিৎসা না করা হয় তবে এ থেকে পায়ের পেশিশক্তি পুরোপুরি চলে যেতে পারে। অন্যান্য অঙ্গের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে, বমি, পাতলা পায়খানা, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। পুরুষের যৌনাঙ্গ অকেজো হওয়াও এই রোগেরই জটিলতার ফল।

সুগার কমে যাওয়া

ভূমিষ্ট হওয়ার পর পর গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের কারণে মায়ের বাচ্চাদের সুগার মাত্রাতিরিক্ত কমে যেতে পারে (হাইপোগ্লাইসেমিয়া)।

তাই আসুন সবাই মিলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করি। সুগার নিয়ন্ত্রিত রেখে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা প্রতিরোধ করি। প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধইতো শ্রেষ্ঠ।

ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যায়াম

অধ্যাপক ডা. সিরাজুল হক
এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন)
এফএসিপি (ইউএসএ), এফআরসিপি (ইডিন)
স্পেশালিস্ট নিউরোলজি ও ইন্টারনাল মেডিসিন
চিফ কনসালটেন্ট, নিউরোলজি
চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, ধানমন্ডি।

ভূমিকা

ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণের চারটি প্রধান উপায় হলো, (১) খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, (২) সুশৃংখল জীবনযাপন, (৩) রক্তে গ্লুকোজ হ্রাসকারী ওষুধ ব্যবহার এবং (৪) নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম। ব্যায়াম করে যে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এটা নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। ইনসুলিন আবিষ্কারের বহু আগে, প্রায় ২১০০ বছর আগে ভারতবর্ষের চিকিৎসক সশ্রুত এবং গ্রিক চিকিৎসক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল ডায়াবেটিস রোগ চিকিৎসায় ব্যায়ামের সুফলের কথা বর্ণনা করেছিলেন।

১৯২১ সালে ইনসুলিন আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা গেল যে ব্যায়াম করলে ইনসুলিনের রক্তে গ্লুকোজ হ্রাস করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। ডায়াবেটিক রোগী এবং ডায়াবেটিস রোগবিহীন স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রেও একই উপকার লক্ষ করা যায়। যেহেতু গ্লুকোজ হ্রাস করাটাই এ রোগের চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য তাই ব্যায়ামকে ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় বেশি করে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হয়।

ব্যায়ামের সুফল ইনসুলিন অনির্ভরশীল ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে সরাসরিভাবে দেখা যায়। এছাড়াও ব্যায়াম করলে ইনসুলিন নির্ভরশীল ও ইনসুলিন অনির্ভরশীল উভয় ক্ষেত্রেই কিছু সুদূরপ্রসারী সুফল উভয় শ্রেণির রোগীদের বেলাতে পাওয়া যায়, সেগুলো হলো উচ্চ রক্তচাপ হ্রাস, রক্তে উপকারী কোলেস্টেরল HDL বৃদ্ধি এবং ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল LDL এবং VLDL-এর অনুপাত হ্রাস। ফলে ইনসুলিন নির্ভরশীল এবং ইনসুলিন অনির্ভরশীল দুই ধরনের ডায়াবেটিক রোগীই ব্যায়াম করে উপকৃত হয়।

ব্যায়াম ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে রক্তে গ্লুকোজ হ্রাস করে, তবে কখনো কখনো রক্তে গ্লুকোজ খুব বেশি কমে গেলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে ব্যায়ামের সুফল সম্পর্কে জানার জন্য ব্যায়ামের সময় গ্লুকোজের বিপাক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

ব্যায়াম চলাকালীন সময়ে গ্লুকোজের বিপাক

হিসাব করে দেখা গেছে যে, এক থেকে দেড় ঘণ্টা ব্যায়াম চলতে থাকলে ফ্রি ফ্যাটি এসিড শরীরে প্রধান শক্তি উৎপাদক হিসেবে কাজ করে থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম করলে গ্লুকোজের ব্যবহার কমিয়ে ফ্রি ফ্যাটি এসিড ব্যবহারের ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। অনিয়মিত ব্যায়াম করলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণের খুব একটা তারতম্য হয় না, তবে ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে কদাচিৎ রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ মাত্রাতিক্ত হ্রাস পেতে পারে (হাইপোগ্লাইসেমিয়া)।

ব্যায়াম চলাকালীন শক্তি উৎপাদন একটা জটিল প্রক্রিয়া। একদিকে ইনসুলিন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমানোর চেষ্টা করে এবং চর্বি ও লিভার গ্লাইকোজেনের ব্যবহার কমিয়ে শরীরে সঞ্চিত শক্তি খরচে বাধা দেয়। অপরদিকে বিপরীতধর্মী প্রাণরসগুলো (Counter regulatory hormones) যেমন-গ্লুকোগণ, এড্রিনালিন, নর এড্রিনালিন, কার্টিসোল, গ্রোথ হরমোন প্রভৃতি প্রাণরসগুলো লিভার গ্লাইকোজেন থেকে শর্করা এবং চর্বির আধার থেকে ফ্রি ফ্যাটি এসিড সরবরাহ বাড়িয়ে শক্তি ক্ষয় করে এবং রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা কমে যাওয়া রোধ করে। ব্যায়ামের সময় এই দুই বিপরীতধর্মী প্রাণরসের সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয়ে গ্লুকোজের ব্যবহার কমে ক্রমান্বয়ে ফ্রি ফ্যাটি এসিডের ব্যবহার বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা লিভার নিঃসৃত গ্লুকোজের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ইনসুলিন অনির্ভরশীল ডায়াবেটিস রোগে ব্যায়ামের বিশেষ ভূমিকা

ইনসুলিন কাজ করে কোষের গায়ে লেগে থাকা নির্দিষ্ট ইনসুলিন গ্রাহকের মাধ্যমে। ব্যায়াম করলে এই গ্রাহকের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কোষের গায়ে ইনসুলিন লেগে যাওয়ার প্রবণতাও বেড়ে যায়।

কীভাবে ব্যায়াম করবেন?

চিকিৎসক প্রথমে পরীক্ষা করে দেখবেন যে রোগী ডায়াবেটিস সংক্রান্ত অত্যাধিক অগ্রসরমান কোনো জটিলতায় ভুগছেন কিনা, যেমন রেটিনার জটিলতা, স্নায়ুবিক জটিলতা, প্রান্তীয় রক্তনালির জটিলতা ইত্যাদি।
হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতার ধারণা নেওয়ার জন্য ৩৫ বছরের বেশি বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে ইটিটি (exercise tolerance test) এবং সঙ্গে ইকোকার্ডিওগ্রাম করে দেখা যেতে পারে।

ব্যায়ামের ধরন : মুক্ত বায়ুতে দ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, জগিং বা সাঁতার কাটা।
সর্বোচ্চ ক্ষমতার শতকরা ৫০-৭০ভাগ পর্যন্ত ব্যায়াম করা যেতে পারে। সময় : ২০-৩০মিনিট, সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ দিন, দৈনিক ব্যায়াম করতে পারলে আরও ভালো।
একদম শুরুতে ধীরে ধীরে ব্যায়াম আরম্ভ করতে হবে এবং ব্যায়ামের শেষে হঠাৎ করে পেশি সঞ্চালন বন্ধ না করে ধীরে ধীরে ব্যায়াম কমিয়ে আনতে হবে।
সর্বাধিক উপকারের জন্য সুবিধাজনক স্থানে পছন্দ অনুযায়ী ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

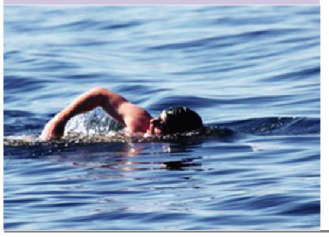

ব্যায়ামের দীর্ঘকালীন সুফল

- ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি
- ইনসুলিন ও গ্লুকোজ হ্রাসকারী খাওয়ার বড়ির প্রয়োজনীতা হ্রাস
- রক্তে গ্লুকোজ বৃদ্ধি প্রবণতা হ্রাস
- উপকারী (HDL) কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পাওয়া
- অপকারী (LDL এবং VLDL) কোলেস্টেরল কমে যাওয়া।
- শরীরের ওজন কমে যাওয়া
- উচ্চ রক্তচাপ কমে যাওয়া
- শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা বৃদ্ধি
- দেহমনে প্রশান্তি আনা এবং ব্যায়াম চালিয়ে যেতে পারলে সুন্দর ও সুস্থ জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান।

তবে আমিষ ও চর্বি দুই ধরনের কোষেই গ্লুকোজের বাহক এক ধরনের আমিষের (glucose transport protein) সংখ্যা এবং কার্যক্ষমতাও বেড়ে যায়। ফলে ব্যায়ামের সময় কোষগুলোতে অধিক পরিমাণে গ্লুকোজ ঢোকে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে স্বাভাবিকের পর্যায়ে আসতে থাকে। তবে যেসব ডায়াবেটিক রোগী অতিরিক্ত ব্যায়াম করছেন এবং সঙ্গে রক্তে শর্করা হ্রাসকারী অথবা ইনসুলিন ব্যবহার করছেন তাদের রক্তে গ্লুকোজ যাতে অস্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে না যায় সেজন্য গ্লুকোজ হ্রাসকারী বড়ি অথবা ইনসুলিনের পরিমাণ কমানোর প্রয়োজন হতে পারে। ইনসুলিন অনির্ভরশীল ডায়াবেটিস রোগীর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম এবং স্থূলকায় রোগীদের ওজন কমানো। এরপর রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্লুকোজ হ্রাসকারী বড়ি এবং কারও কারও ক্ষেত্রে ইনসুলিনও ব্যবহার করা হয়। যাদের রক্তে গ্লুকোজ স্বাভাবিকের চাইতে বেশি কিন্তু ডায়াবেটিস হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা এখনো অতিক্রম করেনি (glucose intolerance) এইসব রোগী ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন কমিয়ে এবং ইনসুলিনের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে বহুদিন নিজেকে ডায়াবেটিস রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারেন।

কুফল (ইনসুলিন অনির্ভরশীল রোগীদের জন্য)

- ডায়াবেটিস রোগীর ব্যায়ামের সময় বুকে ব্যাথা, বুক ধড়ফড় করা এবং হঠাৎ মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা সুস্থ ব্যক্তিদের চাইতে বেশি।
- ব্যায়ামের সময় সাময়িক রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে চোখের রেটিনার ব্যাধি (Proliferative retinopathy) বৃদ্ধি এবং অক্ষিগোলকের ভেতর রক্তক্ষরণের (vitreous hemorrhage) প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে।
- ব্যায়ামে কিডনির রোগ বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু প্রস্রাবে আমিষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে।
- স্বয়ংক্রিয়স্নায়ুরোগে (autonomic neuropathy) আক্রান্ত এবং প্রান্তীয় রক্তনালি সরু হয়ে যাওয়া রোগীর কঠোর পরিশ্রম হবে এমন ব্যায়াম না করাই উত্তম।

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ব্যায়ামের কুফলের চাইতে সুফল অনেক বেশি তাই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে এমন সব ব্যায়াম করতে হবে যাতে শরীরের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। এছাড়া খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে রোগীকে অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে এবং অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ব্যায়াম পরিহার করতে হবে।

ব্যায়ামকালীন হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চিকিৎসা

দীর্ঘ সময় মাত্রাতিরিক্ত ব্যায়ামের পর রক্তে গ্লুকোজ অস্বাভাবিক কমে যেতে পারে। এজন্য ব্যায়ামের সময় ডায়াবেটিক রোগীকে সাবধান থাকতে হবে। অতিরিক্ত ক্ষুধা অনুভব, দুর্বলতা এসব রক্তে গ্লুকোজ হ্রাসের উপসর্গ। এ সময় রোগী গ্লুকোজ, ফলের রস অথবা মিষ্টি ফল খেলে রক্তে গ্লুকোজ বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। দীর্ঘ সময় ব্যায়ামের প্রস্তুতি হিসেবে ব্যায়াম শুরু করার আগে রোগী খাবার খেয়ে নিয়ে পারে।
এছাড়া সম্ভব হলে রক্তে গ্লুকোজ মেপে দেখা যেতে পারে। অনেক সময় ব্যবহৃত ইনসুলিনের অথবা খাওয়ার বড়ির পরিমাণ শতকরা ২০-৫০ ভাগ পর্যন্ত কমানোর প্রয়োজন হতে পারে।

এক নজরে ডায়াবেটিস

অধ্যাপক (ডাঃ) মোঃ আব্দুল মান্নান

এমবিবিএস, এফসিপিএস, এমডি (শিশু রোগ), এমডি (নিউনেটলজি)
ফেলো নিউনেটলজি, এন.ইউ.এইচ সিঙ্গাপুর, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সাইন্স, দিল্লি, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন হসপিটাল, ইউকে
নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ
চেয়ারম্যান নবজাতক বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
চেম্বার: ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল।

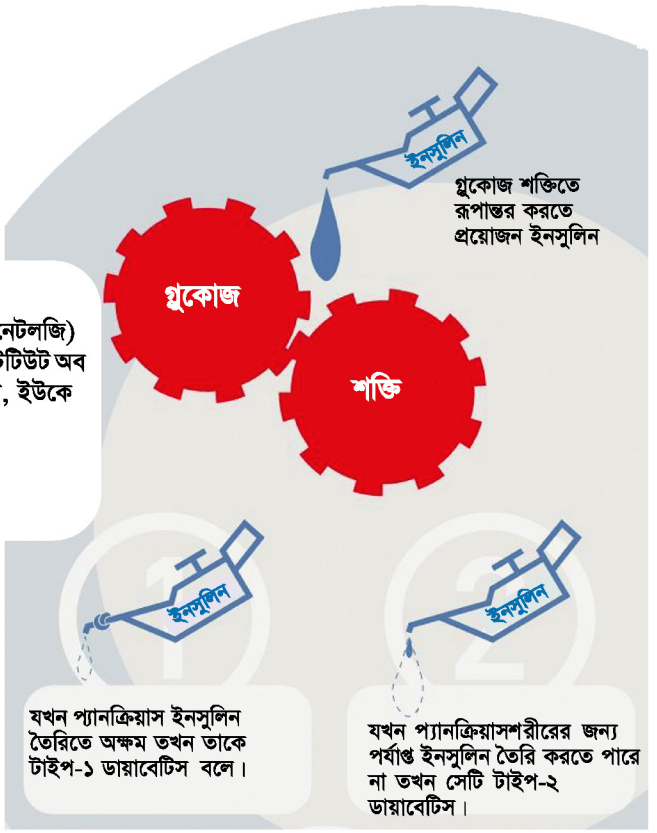

ডায়াবেটিস শরীরের একটি বিপাকজনিত সমস্যা, এই রোগে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। এটি ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে অথবা এর কর্মক্ষমতা লোপ পাওয়ার জন্য হয়ে থাকে। ইনসুলিন শরীরের অগ্নাশয় নামক গ্রন্থির বিটা কোষে তৈরি হয়।

ডায়াবেটিসের প্রকার ভেদ

ডায়াবেটিস প্রধানত দুই প্রকারের হয়ে থাকে:

ক) টাইপ ১ ডায়াবেটিস

খ) টাইপ ২ ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিসের লক্ষণ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডায়বেটিসের সঠিক কারণ জানা যায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসের যেসব লক্ষণসমূহ পাওয়া যায় তা হলো ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, পিপাসা বেশি পাওয়া, অতিরিক্ত ক্ষুধা পাওয়া, ওজন কমে যাওয়া এবং দুর্বল মনে হওয়া। তাছাড়াও ডায়াবেটিস অন্যান্য সমস্যা নিয়েও প্রকাশ পেতে পারে যেমন-ক্ষত না শুকানো, ঘন ঘন শরীরে জীবাণুর সংক্রমণ, চামড়া ছত্রাকের সংক্রমণ, উচ্চ রক্তচাপ ও স্টোক এবং কিডনি সমস্যা, চোখে সমস্যা, চোখে সমস্যা, হৃদযন্ত্রে সমস্যা। নবজাতকের ডায়াবেটিস হলে কম ওজন ও অপরিণত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাছাড়াও এই বাচ্চার ওজন বৃদ্ধি পায় না। শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং জীবাণুর সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস নির্ণয়ে পরীক্ষাসমূহ

- খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ (FBS)
- খাওয়ার দুই ঘণ্টা পর রক্তের গ্লুকোজ (2 hrs after breakfast)
- যেকোনো সময় রক্তের গ্লুকোজ (RBS)
- ওজিটিটি (OGTT)
- গ্লুকোজযুক্ত হিমোগ্লোবিন (HbA_1C)

খালি পেটে গ্লুকোজ ৭.০ মিলি মোল অথবা এর বেশি। যেকোনো রক্তের গ্লুকোজ ১১.১ মিলি মোল অথবা এর বেশি হলে তা ডায়াবেটিস।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ

বয়স ভেদে ব্যায়াম	
৩-৫ বছর	হাঁটা, দৌঁড়ানো
৬-৯ বছর	দৌঁড়ানো, সাঁতার কাটা
১০-১২ বছর	হাঁটা, দৌঁড়ানো, ফুটবল, ক্রিকেট খেলা

খাবার নিয়ন্ত্রণ

সাধারণত প্রতিদিন পাঁচ বার খাবার খেতে হবে। তিন বার নিয়মিত খাবারের সঙ্গে দুইবার হালকা/জলখাবার থাকবে।

● শর্করা > ৫০% ● চর্বি > ৩০-৩৫% ● প্রোটিন > ১০-১৫%

প্রতিদিন পাঁচ ধরনের ফল ও শাকসবজি খেতে হবে। তবে যে সব ফলে মিষ্টির পরিমাণ বেশি থাকে সে সব ফল নিষেধ। আঙ্গুর, আপেল, মাল্টা, টকজাতীয় ফল খেতে পারবে।

ওষুধে চিকিৎসা

সাধারণত দুই ধরনের চিকিৎসা চালু আছে।
টাইপ-১এবং অনিয়ন্ত্রিত টাইপ-২ এর ক্ষেত্রে সাধারণত ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। টাইপ-২ ডায়াবেটিস অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা সম্ভব।

ফলোআপ

গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ হওয়ার পর প্রতি তিন মাস পরপর প্রথম বছর, তারপর ছয় মাস পরপর এক বছর এবং তার পর প্রতিবছর ফলোআপের প্রয়োজন হয়।

প্রতিরোধ

ডায়াবেটিস প্রতিরোধের জন্য ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, সুষম খাবার গ্রহণ, উপযুক্ত ব্যায়াম করা ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সহায়তা করে।

শিশুদের ডায়াবেটিস
প্রতিরোধ ও প্রতিকার

ডা. এম. আর. তালুকদার মুজিব
এমবিবিএস (ঢাকা), এমডি (শিশু স্বাস্থ্য)
শিশু বিশেষজ্ঞ
সহযোগী অধ্যাপক, শিশু বিভাগ
শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), বরিশাল।

কিছু রোগ মানুষের সারা জীবনের রোগ। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'ডায়াবেটিস মেলাইটাস'। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কথায় 'বহুমূত্র'। ১০০ মি.মি. রক্তে সুস্থ মানুষের ৮০-১২০ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ থাকে। এই মাত্রার চেয়ে বেশি হলে ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা থেকে যায়। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রোগ কি শিশুদের হয়? অবশ্যই হয়। এই রোগ শিশুদের হলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি মারাত্মক ব্যাহত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে শিশুদের হরমোন ও বিপাকজনিত সমস্যা হয়, এমনকি তার বয়ঃসন্ধিকালও বিলম্বিত হতে পারে।

দেহকোষে গ্লুকোজ প্রবেশ করার জন্য ইনসুলিন হরমোনটি অপরিহার্য। স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে শর্করা ভেঙে গ্লুকোজ হয় এবং এই গ্লুকোজ রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে পৌঁছায় দেহকোষে জ্বালানি হিসেবে। ইনসুলিনের সহযোগিতায় গ্লুকোজ দেহকোষে প্রবেশ করে খাবার জোগায় শক্তি। ইনসুলিন না থাকলে শিশুদের ডায়াবেটিসে যা হয় গ্লুকোজ দেহকোষে ঢুকতে পারে না এবং জমা হতে থাকে রক্তে। ফলে রক্তের গ্লুকোজের মান বাড়তে থাকে। একটা সময় পর এই গ্লুকোজ প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে আসতে থাকে। এটাই হচ্ছে ডায়াবেটিস রোগের মূলকথা। ডায়াবেটিস মেলাইটাস শিশুর মানসিক, শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

শিশুদের এই রোগ তিন ধরনের হতে পারে। যেমন–

১। টাইপ-১ বা ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিস। এক্ষেত্রে শিশুর জন্য ইনসুলিন খুবই প্রয়োজন। এছাড়া রোগীর জীবন বাঁচানো কঠিন।

২। টাইপ-২ বা ইনসুলিন অনির্ভর ডায়াবেটিস। এ রোগে ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা জরুরি নয়। ইনসুলিন ছাড়া অন্যান্য ওষুধে রোগ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শিশুর শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয়।

ডায়াবেটিস টাইপ-২ সাধারণত বড়দের বেশি হয় এবং শিশুদের কদাচিৎ। কিন্তু দিন এখন পাল্টে গেছে, উন্নত বিশ্বে এখন শিশুদেরও ডায়াবেটিস টাইপ-২ বেশি হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনযাপন পদ্ধতি এই রোগ বিস্তারে বিরাট ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে যে সব শিশু স্থূলকায় তাদের স্বাভাবিক ওজনের শিশুর তুলনায় ডায়াবেটিস বেশি হয়ে থাকে। যাদের পরিবারে ডায়াবেটিস আছে, যারা শরীরচর্চা করে না, বিশেষ জাতিগত শ্রেণি বা গোত্রে এই রোগ বেশি হয়ে থাকে। ফাস্টফুড জাতীয় খাবারের প্রতি ক্রমবর্ধমান আসক্তি, কম হারে দৈহিক পরিশ্রম, ওজন বৃদ্ধি এসব কারণে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ডায়াবেটিস টাইপ-২তে আক্রান্ত শিশুরা বড় হলে সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ কোলেস্টেরলজনিত রোগে ভোগে।

৩। অপুষ্টিজনিত ডায়াবেটিস। আমাদের মতো অনুন্নত দেশগুলোর শিশু-কিশোরদের এ শ্রেণির ডায়াবেটিস হতে দেখা যায়।

উপসর্গ

ডায়াবেটিস হলে বড়দের মতো শিশুদের তেমন দৃশ্যমান কিছু উপসর্গ প্রকাশ পেতে শুরু করে। যেমন–

১। শিশুর প্রচুর পানি পিপাসা হয়
২। সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন প্রস্রাব করে
৩। কিছুক্ষণ পরপরই শিশু খেতে চায়
৪। প্রায়ই রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে দেয়
৫। শিশু খুব দুর্বল হয়ে পড়ে
৬। দেহের ওজন তাড়াতাড়ি হ্রাস পেতে থাকে

ছবিতে ছবিতে
ডায়াবেটিস উপসর্গ

বিছানা ভিজানো

অতিরিক্ত পিপাসা

ঘন ঘন প্রস্রাব

ওজন হ্রাস

অতিরিক্ত দুর্বলতা

বমি, পানি শূন্যতা, শ্বাসকষ্ঠ
এমনকি কোমা

ডায়াবেটিস কোনো ভয়ঙ্কর রোগ নয়। এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে সারা জীবন সুস্থভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে, এমন হাজারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই শিশুর ডায়াবেটিস নিয়ে অযথা হতাশ ও উদ্বিগ্ন হবেন না। অস্থিরও হবেন না। এতে শিশু ভীত হয়ে নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারে। গুটিয়ে নিতে পারে সব ধরণের কর্মকাণ্ড থেকে। মনে রাখবেন, আপনার অপরিসীম ধৈর্য্য, ঐকান্তিকতা আর ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে আপনার সন্তান ডায়াবেটিস রোগ নিয়েও সুস্থভাবে জীবন গড়ে তুলতে পারবে।

এসব লক্ষণ বা উপসর্গেও মা-বাবারা ধারণাই করেন না যে শিশুর ডায়াবেটিস। এটি বাড়তে বাড়তে শিশুর চামড়ায় সংক্রমণ ঘটে। শিশু বার বার পেট ব্যথার কথা বলে। কখনো বমি বমি ভাব কিংবা বমি হয়। মা-বাবা ভয় পেয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। রক্ত পরীক্ষায় দেওয়া মাত্রই ধরা পড়ে শিশুর ডায়াবেটিস।
বয়স্কদের মতো শিশুদেরও ডায়াবেটিস হওয়ার কারণ সঠিক না জানা গেলেও কিছু কিছু কারণে শিশুদের ডায়াবেটিস হতে পারে যেমন–

১। বংশগত

২। জিনের গঠনগত কারণ

৩। দেহে দুর্বল রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা

৪। অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব।

চিকিৎসা

শিশুর টাইপ-১ ডায়াবেটিসে এখনো একমাত্র চিকিৎসা হলো 'ইনসুলিন'। যদি টাইপ২ ডায়াবেটিস হয় সে ক্ষেত্রে মুখে সেবনযোগ্য ওষুধে রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাধ্যতামূলক ইনসুলিনের প্রয়োজন পড়ে না।

অপুষ্ট শিশুদের ডায়াবেটিসে প্রথমদিকে ইনসুলিনে রোগ নিয়ন্ত্রণে এনে পরে মুখে সেবনযোগ্য ওষুধে দেওয়া হয়। কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে বয়স্কদের মতো পরিমাণ সীমিত না করাই ভালো। শিশুর বয়স অনুযায়ী শর্করা ৫০ ভাগ, আমিষ ১৫ ভাগ ও চর্বি ৩০-৩৫ ভাগ রেখে ক্যালরি ঠিক রাখা উচিত। শিশুকে মিষ্টি না দেওয়াই উচিত।

শিশুর ডায়াবেটিসের ব্যাপারে নিশ্চিত হলে ভেঙে পড়বেন না, বরং মনোবল দৃঢ় করুন এবং সঠিকভাবে সন্তানের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে মনোযোগী হোন।

প্রথমেই পুষ্টিবিদ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে একটি খাদ্যতালিকা তৈরি করে নিন। খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ওপর ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রণ অনেকটা নির্ভরশীল।

শিশুকে কখনো উচ্চ ক্যালরি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার দেবেন না। বড়দের জন্যও কিন্তু এসব খাবার ক্ষতিকর। তাই তাদেরও এসব বাদ দেওয়া উচিত।

খাবার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সন্তানের পর্যাপ্ত শরীরচর্চার ব্যবস্থা করতে হবে। শুয়ে-বসে থাকা, টিভি দেখা, কম্পিউটার গেমস খেলে সময় কাটানোর চেয়ে বাইরের খেলাধুলার দিকে সন্তানকে আকৃষ্ট করতে হবে।

বিশেষ করে টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে প্রতিদিন আধঘণ্টা করে সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন শরীর চর্চা করলে সুফল পাওয়া যায়। এসবের পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ মতো টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য ট্যাবলেট এবং টাইপ-১ ডায়াবেটিসের জন্য ইনসুলিন ইনজেকশন দিতে হয়।

অভিভাবকদের এ ইনজেকশন দেওয়া শিখে নিতে হবে এবং সন্তান একটু বড় হলে তাকেও শিখিয়ে দিতে হবে। এর সঙ্গে সব সময় গ্লুকোমিটার দিয়ে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা দেখে একটি চার্টে লিখে রাখুন। গ্লুকোজের মাত্রা খুব বেশি বা কম হলে চিকিৎসকের পরমার্শ মতো ইনসুলিনের ডোজ ঠিক করে নিন।

শিশুদের ইনসুলিন-নির্ভরশীল অর্থাৎ টাইপ-১ ডায়াবেটিস বেশি হয়; আর এ ধরনের ডায়াবেটিসে হঠাৎ রক্তে গ্লুকোজ কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ অবস্থাটা শিশুর জন্য খুবই মারাত্মক। তাই ইনসুলিন দেওয়ার পর পর্যাপ্ত খাবার দিতে হবে। ইনসুলিন দেওয়ার পর শিশুকে গরম পানিতে গোসল না করানো ভালো। এতে ইনসুলিন সহজে রক্তনালি দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং গ্লুকোজের পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিতে পারে।

রক্তে গ্লুকোজ কমে যাওয়ার লক্ষণগুলো হলো প্রচুর ঘাম, মাথাব্যথা, তন্দ্রা ভাব, বুক ধুঁকপুক করা, চোখে ঝাপসা দেখা, খিঁচুনি, আচরণগত পরিবর্তন, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এসব লক্ষণ দেখা দিলে গ্লুকোমিটারে গ্লুকোজের পরিমাণ দেখে নিয়ে শিশুকে মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়াতে হবে। তাই সন্তান স্কুলে যাওয়ার সময় তার পকেটে বা ব্যাগে মিষ্টিজাতীয় খাবার রেখে দিন। স্কুলের শিক্ষকদেরও এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। সম্ভব হলে স্কুলে একটি গ্লুকোমিটার রাখা উচিত এবং দুই-একজন শিক্ষককে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা দেখে ইনসুলিন প্রয়োগের পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাওয়া ছাড়াও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শিশুর চোখ, কিডনি, হৃৎপিণ্ড, থাইরয়েড ইত্যাদির বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। তাই এসব জটিলতার বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে এবং নিয়মিত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। তবে তার খাওয়া-দাওয়া ও জীবনাচরণে খুব বেশি কঠোরতা আরোপ করবেন না। ডায়াবেটিস শিশুর সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করুন এবং তাকে সবার সঙ্গে মিশতে দিন।

মাঝে-মধ্যে সামান্য বেশি খেলেও ক্ষতি নেই। সেদিন একটু বেশি সময় ব্যায়াম বা একটু বেশি মাত্রার ইনসুলিন দিলেই চলবে। মূলত ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সমঝোতায় হাঁটুন। প্রয়োজনে সন্তানকে পুষ্টিবিদ ও চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে গিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন। অন্য যেসব শিশু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাদের সঙ্গেও মিশতে দিন।

ডায়াবেটিসের কারণ ও প্রতিকার

ডা. মো. সাজ্জাদ হোসেন
এমবিবিএস (ডিএমসি), এফসিপিএস (মেডিসিন)
হৃদরোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), উত্তরা

ডায়াবেটিস একটি হরমোন ও বিপাকজনিত রোগ। মানবদেহে অগ্নাশয় থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন গ্লুকোজের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্নাশয় থেকে যথেষ্ট ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে অথবা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে যদি উৎপন্ন ইনসুলিন শরীরে সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক থেকে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাকেই ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ বলে। ডায়াবেটিস রোগকে নীরব ঘাতক বলা হয় কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রোগীর কোনো প্রকার উপসর্গ থাকে না; সেক্ষেত্রে রোগী কোনো কষ্ট বুঝে উঠার আগেই রোগের জটিলতা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের যেমন কিডনি, হৃতপিন্ড, চোখ, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদির কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। ডায়াবেটিসের উপসর্গ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে, যাতে কোনো জটিলতা তৈরির আগেই প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটি ধরা পড়ে।

ডায়াবেটিসের কারণ

যে কেউ যেকোনো বয়সে যেকোনো সময় ডায়বেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে নিম্নোক্ত শ্রেণির ব্যক্তিদের মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

১। যাদের বংশে বিশেষ করে মা-বাবা বা রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে।

২। যাদের ওজন বেশি।

৩। যারা যথেষ্ট ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করে না এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করে।

৪। যাদের উচ্চ রক্তচাপ এবং রক্তে কোলেস্টেরল বেশি থাকে।

৫। যে মহিলাদের গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস ছিল।

৬। যারা দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করেন।

ডায়াবেটিসের প্রতিকার

ডায়াবেটিস প্রতিকারের প্রথমটি হলো প্রাথমিক প্রতিরোধ বা প্রাইমারি প্রিভেনশন। ডায়াবেটিসের কারণ সম্পর্কে জেনে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনে অনেক ক্ষেত্রেই রোগ হওয়ার আগেই একে প্রতিরোধ করা যেতে পারে, যেমন–

১। সুষম ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণ : অতিরিক্ত চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করা। যথেষ্ট শাক-সবজিও ফলমূল গ্রহণ করা। অধিক ক্যালরিযুক্ত খাবার যেমন ফাস্টফুড, কোমল পানীয়, চকলেট, আইসক্রিম ইত্যাদি পরিহার করা।

২। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করা।

৩। ওজন নিয়ন্ত্রণ করা।

৪। চিন্তামুক্ত সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করা।

৫। যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম নেওয়া ও ঘুমানো।

৬। যাবতীয় নেশাজাতীয় দ্রব্য যেমন মদ্যপান, ধূমপান থেকে বিরত থাকা।

ডায়াবেটিস প্রতিকারের দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে দ্রুত রোগ সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং ডায়বেটিস সনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে এ রোগকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে যেন কোনো জটিলতা তৈরি না হতে পারে। ডায়বেটিস রোগ সম্পূর্ণভাবে নিরাময়যোগ্য নয়, তবে এ রোগ হয়েছে জেনে দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। সুশৃঙ্খল জীবনযাপন ও নিয়মিত চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব। এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি নিয়ম মেনে চলতে হয়–

(১) ডায়াবেটিস সম্পর্কে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ

(২) সুষম খাদ্য ব্যবস্থা

(৩) যথেষ্ট শারীরিক ব্যায়াম

(৪) প্রয়োজনীয় ওষুধ গ্রহণ।

প্রতিকারের তৃতীয় ধাপে রয়েছে ডায়াবেটিস রোগীদের যাদের ইতিমধ্যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তাদের সঠিক চিকিৎসা দেওয়া এবং আরও জটিলতা এড়াতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া।

ডায়াবেটিসজনিত চক্ষু রোগ

ডা. আঞ্জুমান আরা আক্তার

এমবিবিএস, ডিএনএম (ডিইউ)
এমডি (এন্ডোক্রাইনলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম) বিএসএমএমইউ
অধ্যাপক/প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম।
ডায়াবেটিস, থাইরয়েড, হরমোন ও নিউক্লিয়ার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক) চট্টগ্রাম।

ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ, এই রোগটি মারাত্মক কিছু শারীরিক জটিলতা তৈরি করতে পারে। জটিলতাগুলোর মধ্যে ডায়াবেটিসজনিত চক্ষু রোগ অন্যতম। যেমন-ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, চোখে ছানি ইত্যাদি। যথাসময়ে রোগ নির্ণয় এবং সুচিকিৎসার মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করা করা সম্ভব।

দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা দুই ধরনের হতে পারে
Microvascular- যা ছোট রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হয়।
Macrovascular- যা বড় রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে হয়।
ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি বা ডায়াবেটিসজনিত চক্ষু রোগে চোখের ছোট ছোট রক্তনালির ক্ষতি হয় এমন একটি জটিলতা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, রক্তে শর্করা এবং রক্তচাপের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতাগুলো হ্রাস করা সম্ভব। যে সব কারণের ওপর সাধারণত জটিলতাগুলো নির্ভর করে তা হচ্ছে
ক) ডায়াবেটিসের সময়কাল বা রোগী কতদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন।
খ) রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা।

এছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলো হলো বয়স, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান, অত্যধিক মোটা হওয়া, রক্তের চর্বির পরিমাণ বেশি হওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম না করা ইত্যাদি। যেমন টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে জটিলতাগুলো হয় সাধারণত ১০ বছর পর আর টাইপ টু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে রোগী সাধারণত এ ধরনের জটিলতা নিয়েই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। এই জটিলতাগুলো নিরসনে, নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে-

১. রক্তে শর্করার পরিমাণ
২. উচ্চ রক্তচাপ
৩. রক্তে চর্বির পরিমাণ
৪. ধূমপান

ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথির লক্ষণ : চোখে ঝাপসা দেখা বা চোখে দেখতে না পাওয়া।

নির্ণয়ের পদ্ধতি : ➧ নিয়মিত দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করা।
➧ Cataract নির্ণয়, ➧ Ophthalmascopy
➧ Colour fundal photography ➧ Flurescein angiography

যারা T1 DM এ ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে।
যারা T2 DM এ ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে।
যদি ডায়াবেটিসজনিত চক্ষু রোগ নির্ণয় না হয় তাহলে প্রতি দুই বছর পর পর এবং যদি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি থাকে তাহলে প্রতি বছর চক্ষু বিশেষজ্ঞকে চোখ দেখানো প্রয়োজন।
ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি যদি শেষ পর্যায়ে নির্ণিত হয় (Sight Loss) আরও ঘন ঘন চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে।
যেসব নারী আগে থেকে ডায়াবেটিসে ভুগছেন এবং বাচ্চা নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন বা গর্ভাবস্থায় আছেন তাদের পুরো গর্ভকালীন সময়ে চোখ দেখানো প্রয়োজন। কারণ ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি থাকলে গর্ভাবস্থায় আরও খারাপের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
ডায়াবেটিসজনিত চক্ষু রোগের কারণে রোগী সম্পূর্ণ অন্ধ হয়েও যেতে পারেন। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়, সময়মতো চিকিৎসা, রক্তে শর্করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক রাখলে ডায়াবেটিসজনিত চক্ষু রোগ এড়ানো সম্ভব ।

প্রতিরোধের উপায়

- রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- লেজার Photocoagulation

ডায়াবেটিস এবং পায়ের যত্ন

ডা. মো. কামরুজ্জামান সরকার

এমআরসিপি (ইউকে), এফসিপিএস (মেডিসিন), এমবিবিএস
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও ডায়াবেটোলজিস্ট
সহকারী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ
রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), রংপুর।

ডায়াবেটিক রোগীদের প্রায়ই পায়ের জটিলতা দেখা যায়। এই জন্য ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ের যত্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ডায়াবেটিক রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি থাকার অন্যতম কারণ হলো পায়ের ক্ষত। ডায়াবেটিক রোগীদের অন্যান্য জটিলতা যেমন হার্ট অ্যাটাক, ব্রেইন স্ট্রোক, কিডনির জটিলতা, চোখের জটিলতা এসবের তুলনায় পায়ের জটিলতায় হাসপাতালে ভর্তি থাকার হার অনেক বেশি।

ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ের ক্ষতের কারণ

ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ের অনুভূতি ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে এবং পায়ের ছোট ছোট রক্তনালি প্রদাহজনিত কারণে সঙ্কুচিত হয়ে আসে। এসবের কারণে ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ে সূক্ষ্ম ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। এই সূক্ষ্ম ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ হয়ে আলসার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের প্রদাহের কারণ এখনো সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়ে থাকে যে ক্রমাগতসূক্ষ্ম আঘাত এবং ধীরে ধীরে অস্থিসন্ধির ক্ষয় ক্রমাগত অস্থিসন্ধিকে অকেজো করে তুলে। এই ধরনের পরিস্থিতিকে বলা হয় সারকোট জয়েন্ট (Charcot joint) অথবা সারকোট নিউরো আর্থ্রোপ্যাথি ।

ডায়াবেটিক রোগীদের পায়ের ক্ষত প্রতিরোধে করণীয়

- প্রত্যেক ডায়াবেটিক রোগীর উচিত প্রতিদিন তার নিজের পা একবার পর্যবেক্ষণ করা যেন সূক্ষ্ম ক্ষত প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে
- ডায়াবেটিক রোগীদের পা, আঙুলের মাঝে ফাঁকগুলো প্রতিদিন ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত
- পায়ের আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য পায়ে ময়েশ্চারাইজার লাগানো উচিত
- পায়ের নখগুলো নিয়মিত যত্ন সহকারে কাটা এবং মসৃণ করা উচিত
- প্রতিদিন পায়ের মোজা পরিবর্তন করা উচিত এবং সব সময় পরিষ্কার মোজা পরিধান করা উচিত
- ডায়াবেটিক রোগীরা কোনো অবস্থাতেই খালি পায়ে হাঁটবেন না
- সূক্ষ্ম কোনো ক্ষত দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ ব্যবহার করতে হবে
- পায়ে কোনো ফোসকা দেখা দিলে সেটি কখনোই গলাবেন না
- বাজারে সহজলভ্য কর্ন অথবা ক্যালাস নরম করার ওষুধপত্র এড়িয়ে চলা উচিত
- পায়ের ক্ষত সৃষ্টির উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রে : (ক) নিজে নিজে পায়ের কর্ন বা শক্ত চামড়া কখনোই সরিয়ে ফেলবেন না, (খ) খুব বেশি ঠান্ডা এবং খুব বেশি গরম থেকে পা রক্ষা করবেন।
- পায়ে কোনো ক্ষত দেখা দিলে পেডিয়াট্রিস্ট বা ডায়াবেটিক পায়ের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত
- যে সব ডায়াবেটিক রোগীর অতীতে পায়ের ক্ষত দেখা দিয়েছে অথবা যাদের পায়ের অস্থিসন্ধিগুলো বিকৃত হয়ে গিয়েছে তাদের উচিত বিশেষভাবে নির্মিত পায়ের জুতা পরিধান করা যেন পরবর্তিতে নতুন করে পায়ের ক্ষত দেখা না দেয়।

প্রতি বছর একবার করে ডায়াবেটিক রোগীদের পা চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিত। যদি দেখা যায় যে পায়ের অনুভূতি কম, পায়ের ত্বকের কোনো রং পরিবর্তন হয়েছে অথবা পায়ের রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এ ধরনের রোগীর পায়ের ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি অনেক, এই ধরনের রোগীকে ডায়াবেটিক ফুট বিশেষজ্ঞ (Podiatrist) দেখানো উচিত ।

প্রতিরোধের জন্য

প্রত্যেক ডায়াবেটিক রোগীদের প্রয়োজন সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম এবং যাদের ওষুধের প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত ওষুধ সেবন অথবা ইনসুলিন গ্রহণ। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ডায়াবেটিসজনিত পায়ের ক্ষতের প্রতিরোধ, প্রতিকারের থেকে অনেক সহজ ।

পায়ে ক্ষত হয়ে গেলে করণীয়

দুর্ভাগ্যবশত একবার পায়ের ক্ষত হয়ে গেলে রোগীর উচিত ডায়াবেটিক টিমের সঙ্গে দেখা করা। এই টিমের সদস্য হিসেবে থাকা উচিত একজন ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ, একজন পোডিয়াট্রিস্ট বা ডায়াবেটিক ফুট কেয়ার বিশেষজ্ঞ, একজন ভাসকুলার সার্জন এবং একজন অর্থোটিস্ট বা অস্থিসন্ধি বিশেষজ্ঞ। যেসব রোগীর পায়ের অস্থিসন্ধি বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাদের উচিত সাময়িকভাবে সেই পায়ে শরীরের ভার বহন না করা।

ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ

ডা. উবায়দুল কাদির উজ্জল
এমবিবিএস, এমডি (নেফ্রোলজি)
মেডিসিন ও কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ
যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, যশোর।
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), যশোর।

ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যেখানে শরীর পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না অথবা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। এই ইনসুলিন হচ্ছে এক প্রকার হরমোন যা রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। আর রক্তের অনিয়ন্ত্রিত উচ্চমাত্রার গ্লুকোজ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে কিডনিকেও রোগাক্রান্ত করে।

ডায়াবেটিস কিডনিতে কী করে?

ডায়াবেটিস শরীরের ছোট রক্তনালীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যখন এটা কিডনির রক্তনালীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন কিডনি আমাদের রক্তের বর্জ্য পদার্থকে সঠিকভাবে শরীর থেকে বের করে দিতে পারে না। একই সঙ্গে শরীরে অতিরিক্ত লবণ ও পানি থেকে যায় এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত প্রোটিন বের হয়ে যায়। ফলে রোগীর পায়ের গোড়ালি ফুলে যায় ও শরীরে বর্জ্য জমা হতে থাকে।

ডায়াবেটিস আমাদের স্নায়ুতন্ত্রকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে ফলে আমাদের মূত্রনালি সঠিকভাবে প্রস্রাব বের করতে পারে না। ফলে মূত্রনালিতে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয় এবং আস্তে-ধীরেকিডনির ক্ষতি হতে থাকে। এছাড়া মূত্রনালিতে প্রস্রাব দীর্ঘক্ষণ জমা থাকলে ইনফেকশনের সম্ভাবনাও অনেক বৃদ্ধি পায়।

কী পরিমাণ ডায়াবেটিক রোগীর কিডনি সমস্যা হয়?

টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর প্রায় ৩০ ভাগ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর ১০-৪০ভাগ রোগী কিডনির সমস্যায় ভোগে।

ডায়াবেটিক কিডনি রোগীদের প্রাথমিক লক্ষণ

ডায়াবেটিক কিডনি রোগীর লক্ষণ হিসেবে সর্বপ্রথম প্রস্রাবে অ্যালবুমিন (এক ধরনের প্রোটিন) পাওয়া যাবে এবং এটি সাধারণত ডাক্তারের কাছে কিডনি রোগের জন্য পরামর্শ নেওয়ার অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়। ওজন বেড়ে যেতে পারে ও গোড়ালি ফুলে যেতে পারে। রাত্রে প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে এবং রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। ডায়াবেটিক রোগীদের নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রস্রাবের পরীক্ষা প্রতি বছর অন্তত একবার করা উচিত। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা, উচ্চ রক্তচাপ ও প্রস্রাবে অ্যালবুমিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কিডনি রোগে আক্রান্তের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগের লক্ষণসমূহ

- প্রস্রাবে অ্যালবুমিন/প্রোটিন
- উচ্চ রক্তচাপ
- পা ও পায়ের গিরা ফোলা
- চুলকানি
- রক্তে ক্রিয়েটিনিনও ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজনের মাত্রা বৃদ্ধি
- রাত্রে প্রস্রাবের মাত্রা বেড়ে যাওয়া
- সকালবেলা বমি বমি ভাব অথবা বমি হওয়া
- দুর্বলতা
- ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ও রক্তশূন্যতা

ডায়াবেটিক কিডনি রোগীদের পরিবর্তিত লক্ষণসমূহ

কিডনি বিকল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন (BUN) ও সেরাম ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। রোগীর বমিবমি ভাব, বমি, খাবারে অরুচি, দুর্বলতা, চুলকানি, মাংস-পেশিতে ব্যথা ও রক্তশূন্যতা দেখা দেবে। তখন ইনসুলিনের পরিমাণও কম লাগতে পারে। কারণ অসুস্থ কিডনি ইনসুলিনকে কম পরিমাণে ভাঙতে পারে।

কীভাবে কিডনির কার্যক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব

কিডনি চিকিৎসক বা নেফ্রোলজিস্ট ও পুষ্টিবিদকে সঙ্গে নিয়ে আপনার চিকিৎসা পরিকল্পনা করবেন। কিডনি সুস্থ রাখতে দুটি জিনিস অবশ্য করতে হবে ACEI/ARB ব্যবহার করে রক্তচাপ কমাতে হবে ও কিডনি সহায়ক ডায়াবেটিক খাবার খেতে হবে। খাবারে আমিষের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কিন্তু অতিরিক্ত কম খেলে অপুষ্টির সম্ভাবনা থাকে। রুটিন করে নিয়মিত খেতে হবে।

কিডনি ভালো রাখতে কী করবেন

কিডনিকে ভালো ও কার্যকরী রাখতে হলে–

- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে
- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- যে সব ওষুধ কিডনির ক্ষতি করে সেগুলো বর্জন করতে হবে।
- পুষ্টিবিদের পরামর্শমতো খাদ্যতালিকা প্রণয়ন করতে হবে।
- বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

ডায়াবেটিসের কারণে কিডনি রোগীর ভবিষ্যৎ

বর্তমানে ডায়াবেটিসের ওপর বিশ্বে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নির্মূলে আরও কার্যকরী চিকিৎসা আবিষ্কার হবে। এ সময়ে আপনি আপনার ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

Gaba-Aid
Pregabalin 50 mg & 75 mg Capsule
The Perfect Solution for nerve origin pain
USDMF GRADE API
Quality
Efficacy
Safety
USDMF grade Pregabalin ensures product quality
High quality USDMF grade API demonstrates trusted effect to maintain key pain management
USDMF grade API contains less impurities which ensures patient safety in long term use

ENSURES QUALITY OF LIFE
Labaid Pharma Quality First...
LABAID PHARMACEUTICALS LIMITED
12, Green Square, Green Road, Dhaka-1205, Bangladesh
Phone : 88 02 8617066, Fax : 88 02 9615497
info@labaidpharma.com, www.labaidpharma.com

ডায়াবেটিস রোগীর
দাঁত ও মুখের যত্ন

ডা. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন
বিডিএস, এফসিপিএস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ডেন্টাল কলেজ
কনসালটেন্ট, ল্যাবএইড হাসপাতাল, ধানমণ্ডি।
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনষ্টিক), ঢাকা।

যদি আপনি ডায়াবেটিস রোগী হন তবে এ রোগ আপনার সব অঙ্গকেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যেমন আপনার চোখ, মস্তিষ্ক, হৃদপিন্ড , কিডনি এমনকি আপনার দাঁত কিংবা মাড়িও। এতসব ভয়ংকর তথ্যের মধ্যে আশার কথা হলো, 'আপনি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। আর নিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস আপনার অঙ্গের ক্ষতি করে না।' ডায়াবেটিস রোগীর দাঁত ও মুখের যত্নের আদ্যোপান্ত জেনে নেয়া যাক।

ডায়াবেটিসে মুখে কী কী লক্ষণ হতে পারে?

- প্রথমত থুতু কমে গিয়ে মুখ শুকনা অনুভব হবে।
- থুতু কম হওয়াতে দাঁতে গর্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাবে।
- মাড়ি ফুলে যেতে পারে অথবা আলগা হতে পারে।
- দাঁতে প্লাক জমে যা পরবর্তীতে টারটারে রূপান্তরিত হবে।
- মাড়ি থেকে রক্ত আসতে পারে।
- মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে।
- ঘাঁ/ক্ষত শুকাতে দেরি হয়।
- মুখে স্বাদ কমে যায়।
- সহজেই মুখে জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে।
- বাচ্চাদের ডায়াবেটিস থাকলে অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দাঁত উঠে যায়।

ডায়াবেটিস রোগে মাড়ির রোগ বেশি হয়

ডায়াবেটিক রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে মুখের জীবাণু সহজেই মাড়ি দুর্বল করে দেয়। মাড়ি ফুলে যায়, মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে মাড়ি রোগ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, দাঁত নড়ে যায়, অনেক সময় রোগী অকালেই তার দাঁত হারায়। গবেষণায় দেখা যায় ডায়াবেটিস হলে যেমন মাড়ি রোগ বেশি হয় অপরদিকে মাড়ির রোগ ঠিক না হলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

ডায়াবেটিসে দাঁত ও মুখের যত্ন

- ডায়াবেটিক রোগীর ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি বছরে কমপক্ষে দুইবার (মুখে বা দাঁতে কোনো সমস্যা না হলেও) একজন অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের মাধ্যমে পরীক্ষা করান।
- মুখে যেকোনো প্রকার রোগের লক্ষণ দেখামাত্র দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।
- আপনার দন্ত চিকিৎসককে আপনার ডায়াবেটিস সম্পর্কে অবহিত করুন। এতে ডাক্তার আপনার যেকোনো সার্জিক্যাল প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন।
- নিয়মিত দাঁত ও মুখের পরিচর্যা করুন। দিনে কমপক্ষে দুইবার (রাতে খাওয়ার পর ও সকালে নাশতার পর) সঠিক নিয়মে দাঁত মাজুন। এমন ব্রাশ ব্যবহার করুন যার ব্রিসলের প্রান্ত হবে গোল এবং নরম। সূচালো ব্রিসল ব্যবহার করবেন না।
- দাঁত মাজতে ব্রাশের ব্রিসল মাড়ি ও দাঁতের সংযোগস্থলে ৪৫ ডিগ্রি কোনাকুনিভাবে রেখে হালকা চাপে সামনে পেছনে অল্প কাঁপিয়ে উপরের দাঁত উপর থেকে নিচে এবং নিচের দাঁত নিচ থেকে উপরে পরিষ্কার করুন। ভালো করে দুই মিনিট দাঁত পরিষ্কার করুন। ব্রাশ দিয়ে মাড়ি ও জিহ্বাও পরিষ্কার করুন। প্রয়োজনে ডেন্টাল ফ্লস অথবা ইন্টার ডেন্টাল ব্রাশ ব্যবহার করুন।
- মুখে কৃত্রিম দাঁত (খোলা লাগানো) থাকলে ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে কিছুদিন দাঁত ব্যবহারের পর ঠিক মতো লাগতে চায় না। ফলে মুখে ঘাঁ অথবা থ্রাশ (ফাংগাল ইনফেকশন) হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। কৃত্রিম দাঁত ঠিক মতো না লাগলে দন্ত চিকিৎসকের সাহায্যে ঠিক করিয়ে নিন। খোলা লাগানো দাঁত মাড়ি ও তালুর অনেক অংশ ঢেকে রাখে যা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ক্ষতিকর। সম্ভব হলে খোলা লাগানো দাঁত ব্যবহার না করে স্থায়ীভাবে কৃত্রিম দাঁত লাগিয়ে নিন।
- নিয়মিত কৃত্রিম দাঁত পরিষ্কার করুন এবং রাতে খুলে পানিতে রেখে দিন। খাওয়ার পর ভালোভাবে কৃত্রিম দাঁত পরিষ্কার করুন।
- পান, তামাকজাত দ্রব্য, ধূমপান বর্জন করুন। ডায়াবেটিসে যেমন সব অঙ্গের ক্ষতি হয়; এর সঙ্গে ধূমপান এই ক্ষতিকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

ছবিতে সঠিক নিয়মে দাঁত ব্রাশ

ডায়াবেটিক রোগীদের দাঁতের গর্ত বেশি হয়

সাধারণত মুখে নানা রকম ব্যাকটেরিয়া থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া শর্করা খাবার ভেঙে আঠালো পদার্থ তৈরি করে যা দাঁতে লেগে থাকে। এরপর আরও ব্যাকটেরিয়া এসে এসিড তৈরি করে এতে দাঁতে গর্ত তৈরি হয়। ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে এই এসিড তৈরির পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে সহজেই দাঁতে গর্ত তৈরি হয়। এছাড়া ডায়াবেটিস হলে একদিকে যেমন মুখে থুতু কমে যায় অন্যদিকে গ্লুকোজ বেড়ে যায়, এতে মুখে ফাংগাল ইনফেকশন বেড়ে যায়, বিভিন্ন ঘাঁ/ক্ষত তৈরি হয় যা সহজে ভালো হয় না।

ডায়াবেটিসে করণীয়

ডায়াবেটিস হলে নিরাশ না হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মতো নিয়ন্ত্রিত জীবন, সঠিক ও নিয়মিত ওষুধ সেবন ও পরিমিত আহার গ্রহণ করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কাজেই আপনি ডায়াবেটিক রোগী হলে–

- ডাক্তারের পরামর্শ মতো স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিমিত খাবার গ্রহণ করুন
- ধূমপান বর্জন করুন
- নিয়মিত ওষুধ সেবন করুন
- নিয়মিত দাঁত ও মুখের পরিচর্যা করুন
- নিয়মিত দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে
- সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন

হাড়ের সুস্থতায়
Labcal D

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কাজ সম্পন্ন করতে সুস্থ হাড়ের বিকল্প নেই। হাড়ের ক্ষয়রোগ হাড়ের সুস্থতা বিনষ্টের অন্যতম কারণ। সাধারণত ৪৫ বছরের বেশি বয়সের মহিলারা হাড়ের ক্ষয়রোগে ভুগে থাকেন। আর এর সূচনা হয় শরীরে ক্যালসিয়াম এর ঘাটতি দেখা দিলে। শরীরে ক্যালসিয়াম এর চাহিদা পূরণের জন্য দুধ, দই, পালংশাক, ঢেঁড়স, মটর শুটি, সয়াবিন, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি বেশি করে গ্রহণ করা উচিত। এছাড়াও ভিটামিন ডি সুস্থ হাড় গঠনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান, যা শরীরে সর্বোচ্চ পরিমাণ ক্যালসিয়াম শোষণে সহায়তা করে। শরীরে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি এর অভাব হলে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন-

- হাড়ের ব্যথা
- অস্থিসন্ধিতে ব্যথা
- হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি
- হাত ও পায়ের নখ ভেঙ্গে যাওয়া
- ঘুম কম হওয়া ইত্যাদি।

তাই আমাদের নিয়মিত ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শমতো ব্যবহার করা যেতে পারে। ল্যাবএইড ফার্মা **Labcal D** নামে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ ওষুধ বাজারজাত করছে যা হাড়ের সুস্থতা বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী।

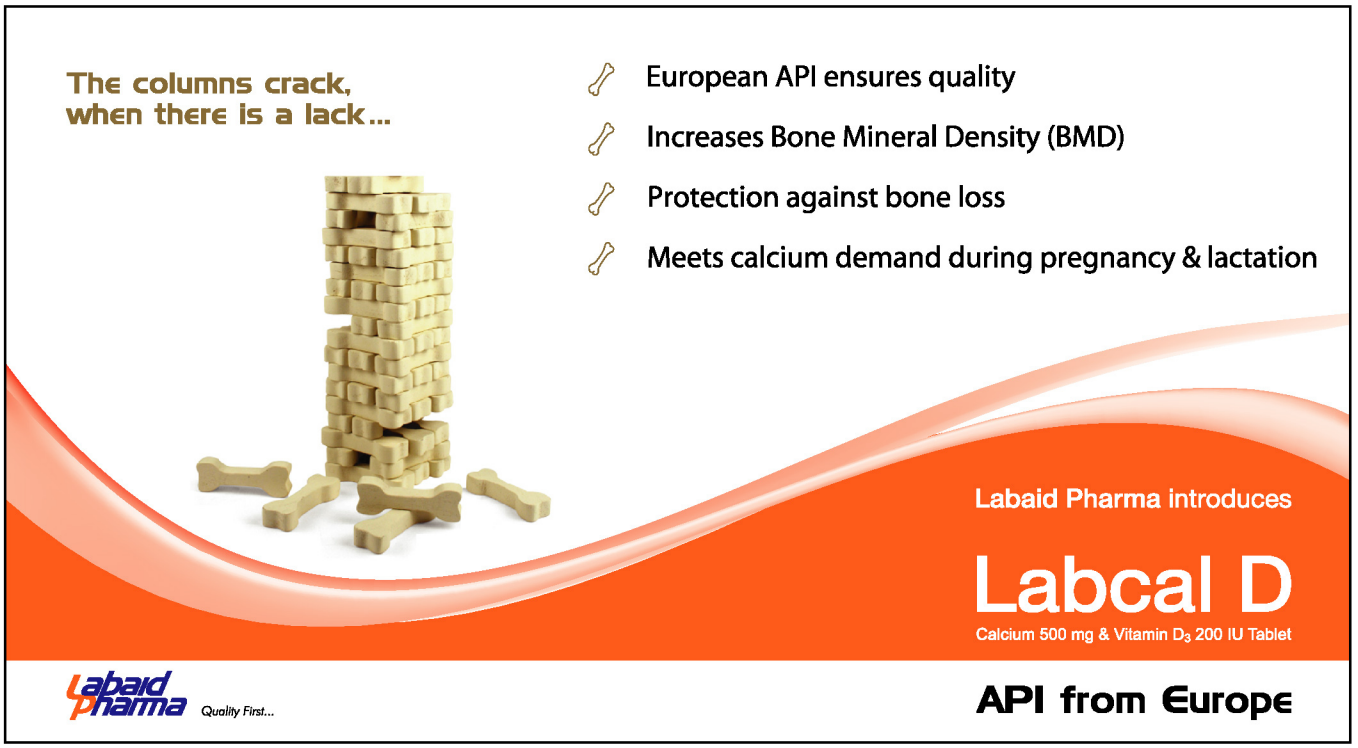

ডায়াবেটিক রোগীর চিনি স্বল্পতা

ডা. শেখ মামুন-অর-রশীদ
এমবিবিএস (ঢাকা), এমডি (ইন্টারনাল মেডিসেন)
কনসালটেন্ট মেডিসিন, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা।
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), খুলনা।

মো. মশিউর। বয়স মাত্র ২৩ বছর। দুই বছর আগে ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পর ডাক্তারের পরামর্শ মতো ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা চলছে। এত দিনে নিজে নিজে ইনসুলিন নেওয়া থেকে শুরু করে মশিউর ডায়াবেটিসের খুঁটিনাটি নিজেই শিখে ফেলেছেন। একদিন সকালে প্রয়োজনমতো ইনসুলিন নিয়ে খুবই অল্প নাশতা করে বেরিয়ে পড়ল সে, আধা ঘণ্টাও হয়নি মাথা ঝিমঝিম করার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি ধরলো সারা শরীরে। তারপর আর কিছু মনে নেই। পড়ন্ত বিকেলে মশিউর বুঝতে পারল সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। অল্প বয়সী ডাক্তার সাহেব যিনি তাকে চিকিৎসা দিয়েছিলেন তিনি জানালেন মশিউরের রক্তে চিনির মাত্রা ভর্তির সময় মাত্র ১.৮ মি মোল/ লি.।

মিসেস অরুনা বিশ্বাস। বয়স ৬২ বছর। বাবার ডায়াবেটিস ছিল। স্ট্রোকে বাবার প্রাণবিয়োগ ঘটেছে বছর সাতেক। ইদানিং তাকে ভয়ে ধরেছে। তিনি হাঁটছেন, সাধ্যমতো ডায়েট করছেন, ওষুধও খাচ্ছেন ডাক্তারের পরামর্শে। ডাক্তারের কাছে শুনেছেন কিডনিটাও ইদানিং ঠিকঠাক কাজ করছে না। তিনি খেয়াল করেছেন মাঝে-মধ্যে বিশেষ করে খেতে দেরি করলে অথবা কম খাওয়া পড়লেই মাথা, হাত-পা ঝিমঝিম করার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি ও বুক ধড়ফড় করেই শরীর ঘেমে যাচ্ছে, তবে কিছু খেলেই সমস্যাগুলো আর থাকছে না। মিসেস অরুনা বিশ্বাস সচারচর রক্তের চিনির মাত্রা মাপেন না, কিন্তু ওইদিন স্ট্রিপে আঙুলের রক্ত দিতেই পাঠ দেখাল ২.৩ মি মোল/লি.।

পাঠক! মশিউর সাহেব ও মিসেস অরুনা বিশ্বাস দুজনেই ডায়াবেটিসের রোগী যারা ভিন্ন ধরনের ডায়াবেটিসে ভুগছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের চিকিৎসার ধরনও ভিন্ন, কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন তাদের দুজনেরই একই ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই সমস্যাটির ডাক্তারি নাম হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তের গ্লুকোজ বা চিনি স্বল্পতা। হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা চিনি স্বল্পতা হচ্ছে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা ৩.৫ মি মোল/লি. এর নিচে নেমে যাওয়া। এবার দেখা যাক কী কী কারণে একজন ডায়াবেটিক রোগী চিনি স্বল্পতায় ভূগতে পারেন।

১) খেতে ভুলে যাওয়া, দেরি করে খাওয়া অথবা অপর্যাপ্ত পরিমাণ খাওয়া।
২) সঠিক মাত্রায়, সময়ে বা সঠিকভাবে ইনসুলিন ও সালফোনাইলইউরিয়া ব্যবহার না করা।
৪) দীর্ঘস্থায়ী পেটের পীড়া বা ডায়ারিয়াজনিত রোগ।
৫) অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যায়াম করা।
৬) ইচ্ছামতো নিজে নিজে ইনসুলিন নেওয়া।
৭) বুকের দুধ খাওয়ানো।

এগুলো ছাড়াও যে সব রোগীদের লিভার, কিডনি সঠিকভাবে কাজ করছে না এবং ক্ষুধামন্দায় ভুগছেন, কিন্তু তারা ডায়াবেটিস চিকিৎসার জন্য ইনসুলিন, সালফোনাইলইউরিয়া অথবা অনেকগুলো ওষুধ একসঙ্গে ব্যবহার করছেন তাদের চিনি স্বল্পতা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

চিনি স্বল্পতার ঝুঁকিসমূহ

১) বয়স খুব অল্প অথবা অনেক বেশি বয়সী ডায়াবেটিক রোগী।
২) দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিক রোগী।
৩) শরীরের খুবই অল্প পরিমাণ ইনসুলিন অথবা ইনসুলিনশূন্যতা।
৪) শরীরের গ্লুকোজ বা চিনির মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার নিচের অবস্থানে রাখার প্রবণতা (< ৪.৫ মি. মোল/লিটার)।
৫) রক্তে চিনি স্বল্পতার উপস্থিতি বুঝতে না পারা।
৬) কিডনির কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া।

একজন ডায়াবেটিক রোগীর চিনি স্বল্পতার লক্ষণগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারলে চটজলদি ব্যবস্থা নিয়ে ভালো থাকতে পারেন, কিন্তু সমস্যা হলো ডায়াবেটিসের বয়স যত বাড়তে থাকে উপসর্গগুলো বোঝার ক্ষমতা তত কমতে থাকে। এবার আমরা চিনি স্বল্পতার লক্ষণগুলো বোঝার চেষ্টা করি : বয়সভেদে চিনি স্বল্পতার

ছবিতে চিনি স্বল্পতার লক্ষণ

অতিরিক্ত ক্ষুদা | চোখে ঘোলা দেখা | বুক ধড়ফড় করা | অতিরিক্ত ঘাম | মনোযোগহীনতা | শরীর কাঁপা

লক্ষণগুলোর বিভিন্নতা দেখা যায়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষণীয়ভাবে ফুটে ওঠে, যেমন: বিরক্তি প্রকাশ বা ঘন ঘন কান্নাকাটি, চঞ্চলতা বা দুষ্টুমি করতে দেখা যায়। বেশি বয়স্ক বা বৃদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে নিউরোলজিক্যাল লক্ষণ যেমন শরীরে কাঁপুনি, চোখে ঝাপসা দেখা, ঘুম ঘুম ভাব এমনকি অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

চিনি স্বল্পতার সাধারণ লক্ষণগুলো হলো

১) শরীর ঘেমে যাওয়া
২) প্রচুর ক্ষিদে পাওয়া
৩) রেগে যাওয়া
৪) শরীর কাঁপুনি দেওয়া
৫) অসহিষ্ণুতা
৬) ঘুম ঘুম ভাব
৭) কথা ঠিকভাবে বলতে না পারা
৮) শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া
৯) শরীর ঝাঁকুনি দেওয়া
১০) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এগুলো ছাড়াও চিনি স্বল্পতার প্রকাশ আরও অনেকভাবে হতে পারে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়টি সনাক্ত করে তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

চিনি স্বল্পতায় কী করবেন?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তে চিনির মাত্রাটা নির্ণয় করে নিতে হবে। যদি মাত্রা জানার ব্যবস্থা না থাকে সেক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীর অবস্থার ওপর নির্ভর করে ব্যবস্থা নিতে হবে, যেমন :

১) জ্ঞান হারায়নি এবং মুখে খেতে পারেন এই ধরনের রোগীদের ১০-১৫ গ্রাম গ্লুকোজের পানি, গ্লুকোজের বড়ি অথবা চিনি বা গুড়ের সরবত খাওয়াতে হবে। জরুরি অবস্থায় হাতের কাছে মিষ্টান্ন, পিঠা পায়েশ যা আছে তা খাওয়াতে হবে।
২) তীব্র চিনি স্বল্পতা এবং রোগী যদি অচেতন বা প্রায় অচেতন অবস্থায় থাকেন সেক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে অথবা ক্লিনিকে ভর্তি করতে হবে অথবা সম্ভব হলে দেরি না করে-

শিরায় (Intravenous) ৭৫ মিলি. ২০% গ্লুকোজ এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ০.২ গ্রাম/কেজি দ্রুত দিতে হবে অথবা ১ মি. গ্রাম গ্লুকাগণ মাংসপেশিতে দিতে হবে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গ্লুকাগণের মাত্রা হবে ০.৫ মিলি গ্রাম।

তীব্র চিনি স্বল্পতা সত্ত্বেও রোগী যদি খেতে সমর্থ হন সেক্ষেত্রে ২৫ গ্রাম খাবার গ্লুকোজ পানীয় অথবা মিষ্টির জল খাওয়ানো যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে গ্লুকোজ, জ্যাম, জেলি অথবা মধু খাওয়ানো যেতে পারে।

অচেতন বা অর্ধচেতন বেশির ভাগ রোগীই ১ ঘণ্টার মধ্যে চেতনা ফিরে পান এবং রক্তের গ্লুকোজের,মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। কোনো রোগী চিকিৎসার পর গ্লুকোজের, মাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার পরও যদি অচেতন থাকেন তবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত কারণ বের করতে হবে।

চিনি স্বল্পতা প্রতিরোধের উপায়

চিকিৎসা করে সারিয়ে তোলার চেয়ে প্রতিরোধই ভালো। প্রতিরোধের উপায়গুলো হচ্ছে : নিয়মিত গ্লুকোজের মাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের জন্য ডায়াবেটিক চার্ট ও অন্যান্য রোগীদের জন্য বাড়িতে (Home monitoring of blood glucose) রক্তের গ্লুকোজ বা চিনির মাত্রা পরীক্ষা করা শেখাতে হবে। প্রতি চার মাস পর পর HBA_1c পরীক্ষা করাতে হবে। সব রোগীদের রক্তের গ্লুকোজের ও HBA_1c গ্রহণযোগ্য মাত্রা শেখাতে হবে।

রক্তের গ্লুকোজের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হবে :
Type I DM – ৪.৫ -৭.৫মিলি মোল/লিটার
Type II DM – ৪ -৭.৫মিলি মোল/লিটার
HBA_1c - $\leq$ ৬.৩%, বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ৭.৫% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

রাতের চিনিস্বল্পতা : (সাধারণত রাত ১১টা-২টারমধ্যে হয়ে থাকে) এই সমস্যা ঠেকানোর জন্য সন্ধ্যার পরিবর্তে রাতে ইনজেকশন নিতে হবে। ইনজেকশন নেওয়ার পর গ্লুকোজের মাত্রা <৬.০ মিলি মোল/লিটার হলে হালকা কিছু খেয়ে নিতে হবে।

ডায়াবেটিক রোগী ভ্রমণের সময় ইনসুলিন ও অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে গ্লুকোজ ড্রিংক, মিষ্টি বিস্কুট, মধু বা অন্যান্য মিষ্টি কনফেকশনারি সঙ্গে রাখবেন যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়।

পরিশেষে এটাই মনে রাখতে হবে যে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ, খাবার তালিকা প্রণয়ন ও পরিমিত খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি ব্যায়াম করতে হবে। চিনিস্বল্পতা ও অন্যান্য জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে প্রত্যেক ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীকে নিয়মিত রক্তের গ্লুকোজ ও অন্যান্য দরকারি পরীক্ষা করাতে হবে। সব ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চললে শুধু চিনি স্বল্পতা কেন, আরও অনেক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে একজন ডায়াবেটিক রোগী সহজেই সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন।

টাইপ- ১ ডায়াবেটিস
টাইপ- ২ ডায়াবেটিস

ডা. এস এম হাসান মুরাদ
এমবিবিএস (ঢাকা), পিজিটি (সার্জারি), সিসিডি (বারডেম)
সিসিসি (হৃদরোগ), ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞ, মেডিসিন ও হৃদরোগ অভিজ্ঞ
আরএমও ফরিদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ফরিদপুর।
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), ফরিদপুর।

ছবিতে ছবিতে টাইপ-১ টাইপ-২ এর উপসর্গ

অস্বাভাবিক তৃষ্ণা

হঠাৎ ওজন হ্রাস

ঘনঘন প্রস্রাব

অস্বাভাবিক ক্ষুধা

প্রচণ্ড দুর্বলতা

চোখে ঝাপসা দেখা

পাতার মতো যে অঙ্গানুটি বোটার সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের (পরিপাকতন্ত্রের অংশ) গায়ে উন্মুক্ত থাকে, সেটিই অগ্নাশয়। এটি একটি মিশ্র গ্রন্থি। এটি নলের সাহায্যে অনবরত এনজাইম সরবরাহ করে খাবারকে ভেঙে দিতে সহায়তা করে। আবার এর গায়ে থাকে অসংখ্য তেল ছিটছিটে দাগ, এই দাগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি "Island of Langerhans" অনেকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাখ লাখ দ্বীপের মতো অবয়ব। এই দ্বীপে আবার পুঞ্জিভূত আছে চার প্রকার কোষ। যা আলফা, বিটা, ডেল্টা ও গামা নামে পরিচিত। আজকে আমরা 'বিটা সেল' নিয়েই আলোচনা করব, এটি শতাব্দির আলোচিত রোগ 'ডায়াবেটিস'-এর রহস্যময় ভূমিকা লুকিয়ে আছে এই বিটা সেল বিন্যাসেই। এর ওপর ভিত্তি করেই ডায়াবেটিস মূলত দুই ভাগে বিভক্ত।
যথা:
১। টাইপ-১ ডায়াবেটিস
২। টাইপ-২ ডায়াবেটিস
নিচে টাইপ-১ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১। টাইপ-১ ডায়াবেটিস: যদি কোনো মানব দেহে অগ্নাশয়ে "Island of Langerhans" এর বিটা সেল একেবারেই অনুপস্থিত থাকে বা কোনো জটিল রোগের কারণে বিটা সেল ধ্বংস হয়ে যায় বা খুবই অল্প পরিমাণ বিটা সেল অবশিষ্ট থাকে যা অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, সেই ব্যক্তিই টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। যা ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। বাজারে বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টি ডায়াবেটিস ওষুধগুলো বিটা সেলকে বাড়তি চাপ দিয়ে বাড়তি ইনুসিল নিঃসরণ করে। যদি কারও বিটা সেলই না থাকে তাহলে ওষুধ কোথায় গিয়ে চাপ প্রয়োগ করবে? এক্ষেত্রে ইনসুলিনই একমাত্র চিকিৎসা। তাই টাইপ-১ ডায়াবেটিস রোগীকে কোনোভাবেই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

সাধারণত অনূর্ধ্ব ২৫ বছরের লোকজন টাইপ-১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া যারা অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে (বিটা সেলকে অতিরিক্ত চাপ দিয়ে) অবশিষ্ট বিটা সেলও ধ্বংস করে ফেলে তারাই ধীরে ধীরে টাইপ-২ ডায়াবেটিস থেকে টাইপ-১ ডায়াবেটিক রোগীতে পরিণত হয়।

২। টাইপ-২ ডায়াবেটিস : সাধারণত ত্রিশোর্ধ্ব লোকজনই টাইপ-২ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। জন্মগত কারণে, জটিল রোগের ফলে (টাইফয়েড, অগ্নাশয়ের সংক্রমণ,অগ্নাশয়ে পাথরসহ অন্যান্য রোগ) এছাড়াও ছোটবেলা থেকে অতিরিক্ত ওষুধ সেবনের ফলেও বিটা সেল ধ্বংস হতে হতে একপর্যায়ে অর্ধেকে নেমে আসে। তখনই হাত-পা অবশ, বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরানো, ওজন হ্রাসসহ ঘন ঘন পানির পিপাসা, বহুমূত্রসহ নানারকম জটিলতায় ভোগে। অবশেষে একপর্যায়ে ধরা পড়ে ডায়াবেটিস নামের অদৃশ্য ব্যাধি। যা টাইপ-২ ডায়াবেটিস নামে পরিচিত। যা বাজারে প্রচলিত ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করা সম্ভব একটা পর্যায় পর্যন্ত। অতিরিক্ত চাপের ফলে যেকোনো বস্তু যেমন অসাড় হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি মাত্রাতিরিক্ত অ্যান্টি-ডায়াবেটিস ওষুধ বিটা সেলকে পুরোপুরি ধ্বংস করে টাইপ-১ ডায়াবেটিসে পরিণত করতে পারে। তাই এই পর্যায়ে ওষুধ বন্ধ করে দ্রুত ইনসুলিন শুরু করে দিলে রোগী আবার প্রাণ ফিরে পেতে পারে। এছাড়াও আধুনিক কিছু ওষুধ অর্ধমৃত বা ক্লান্ত বিটা সেলকে পুনরায় স্পন্দন ফিরে পেতে সহায়তা করে। তাই ডায়াবেটিস চিকিৎসায় ইনসুলিন একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন। যা আবিষ্কার করে বেন্টিং এবং বেস্ট নামের দুইজন বিজ্ঞানী ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। একজন দক্ষ, আদর্শ ডায়াবেটিক রোগী সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলার পথটি মসৃণ করতে পারে। যা তাকে জটিলতাবিহীন জীবন উপভোগে সহায়তা করে। আমরা প্রত্যেক ডায়াবেটিক রোগীর সুস্থ, সুন্দর জীবন কামনা করি।

ডায়াবেটিস নিয়ে ভুল ধারণা

ডা. সরকার মোহাম্মাদ সাজ্জাদ
এমবিবিএস, এমআরসিপি (ইউকে)
মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
বারডেম হাসপাতাল, শাহবাগ ঢাকা
চেম্বার : ল্যাবএইড লি. (ডায়াগনস্টিক), মিরপুর।

ডায়াবেটিস সম্পর্কে এমন সব কাল্পনিক কথা প্রচলিত আছে যেগুলো আসল সত্য সম্পর্কেই সন্দিহান করে তোলে মানুষকে! বর্তমানে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা দ্রুতই বাড়ছে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা খুব কম এবং অজস্র কাল্পনিক কথা প্রচলিত থাকায় মানুষ দুর্দশার মধ্যে পড়েন। আজ আমরা এই লেখাটিতে ডায়াবেটিস নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো ও সঠিক তথ্য সম্পর্কে জানব।

এক নজরে
ডায়াবেটিস নিয়ে ভুল ধারণাগুলো

- শুধু ধনীদের ডায়াবেটিস হয়।
- শুধু বয়স্কদের ডায়াবেটিস হয়।
- শুধু শহরের লোকদের ডায়াবেটিস হয়।
- ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে।
- ডায়াবেটিস একটি অভিশাপ।
- শারীরিক মিলনে ডায়াবেটিস হয়।
- শুধু মোটা লোকদের ডায়াবেটিস হয়।
- ডায়াবেটিস হলে মাটির নিচের খাবার খাওয়া যায় না।
- ডায়াবেটিস হলে বিশেষ ধরনের খাবার খেতে হয়।
- টক ও তিতা জাতীয় খাবার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কার্যকর।
- রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে এলে ডায়াবেটিস ভালো হয়।
- একবার ইনসুলিন নিতে শুরু করলে সারা জীবন ইনসুলিন নিতে হয়।
- ইনসুলিন নিলে যৌন ক্ষমতা কমে যায়।
- ইনসুলিন নিলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।
- শারীরিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হলেই শুধু ইনসুলিন নিতে হয়।
- ইনসুলিন নেওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক।
- ডায়াবেটিস আক্রান্ত মহিলাদের গর্ভধারণ করা উচিত নয়।
- ডায়াবেটিস আক্রান্ত মায়ের সন্তান ডায়াবেটিস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।
- ডায়াবেটিস আক্রান্ত শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না।
- ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

উপরের কথাগুলো সবই ভ্রান্ত এবং একটিও সত্য নয়।

মিষ্টি বেশি খেলে ডায়াবেটিস হয়

সরাসরি মিষ্টি খাওয়ার সঙ্গে ডায়াবেটিস হওয়ার কোনো যোগসূত্র নেই। মিষ্টি বেশি না খেলেও ডায়াবেটিস হতে পারে। আসলে পারিবারিক ইতিহাস, ওজন বৃদ্ধি, অস্বাস্থ্যকর খাবার, শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। মিষ্টি বেশি খেলে ওজন বাড়ার আশঙ্কা থাকে (কেননা মিষ্টি দ্রব্যে ক্যালরি বেশি) আর এ কারণে পরোক্ষভাবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কিছুটা বাড়বে বৈকি।

ডায়াবেটিস হলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব নয়

শর্করা সুনিয়ন্ত্রিত থাকলে এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করলে একজন ডায়াবেটিক রোগী আর দশজনের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবেন। টম হ্যাংকস, হ্যালি বেরি, ল্যারি কিং বা ওয়াসিম আকরামের মতো বিশ্বের অনেক তারকা ব্যক্তিত্ব ডায়াবেটিস নিয়ে চমৎকার জীবনযাপন করছেন। তাই ডায়াবেটিস নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত ব্যায়াম এই তিন হচ্ছে ডায়াবেটিস নিয়ে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র।

ডায়াবেটিসে ইনসুলিন সর্বশেষ চিকিৎসা

ইনসুলিন একজন ডায়াবেটিস রোগীর জীবনে যেকোনো সময়ই লাগতে পারে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়, যেকোনো বড় অস্ত্রোপচারের আগে-পরে, কোনো গুরুতর রোগে হাসপাতালে থাকাকালীন যেমন : হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা মারাত্মক কোনো সংক্রমণের সময়, কিডনি বা যকৃতের জটিলতায় ইনসুলিনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ চিকিৎসা। এ ছাড়া কোনো কারণে রক্তে শর্করা অনেক বেড়ে গেলেও ইনসুলিন দরকার হয়। ব্যাপারটা এমন নয় যে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে মানে আপনার অবস্থা খুব জটিল।

সব ধরনের ডায়াবেটিস একই রকম

বিভিন্ন রকমের ডায়াবেটিস আছে, প্রধান হচ্ছে টাইপ-১ ও টাইপ-২ এবং গর্ভাবস্থার ডায়াবেটিস। প্রতিটা ধরনেরই আলাদা কারণ এবং নিয়ন্ত্রণের আলাদা পদ্ধতি আছে। যদি কারও ডায়াবেটিস হয়ে যায় তাহলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদিনই তাকে সচেষ্ট থাকতে হবে। সব ধরনের ডায়াবেটিসই জটিল ও গুরুতর। শুধুমাত্র গর্ভাবস্থার ডায়াবেটিস বাচ্চার জন্মের পরেই ভালো হয়ে যায়।

ডায়াবেটিস কি বংশগত?

কারও বাবার ডায়াবেটিস থাকলে তার ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা অন্যদের তুলনায় ছয়গুণ বেশি। মায়ের ডায়াবেটিস থাকলে এ আশঙ্কা বাড়বে তিনগুণ আর মা-বাবা উভয়ের থাকলে এ আশঙ্কা ২০ গুণ বেড়ে যাবে। সুতরাং ডায়াবেটিসে বংশগত প্রভাব কিছুটা তো আছেই।

ডায়াবেটিক রোগীদের কী বিশেষ খাবার খেতে হয়!

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য একটি খাবার তালিকা সুস্থ মানুষের স্বাস্থ্যকর খাবার তালিকা থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। কম চর্বি, পরিমিত লবণ আর চিনি; এর সঙ্গে পূর্ণ দানাযুক্ত খাদ্য, শাকসবজি ও ফলমূল এগুলোর মিশ্রণই হতে পারে আদর্শ খাবার। তথাকথিত ডায়াবেটিক খাবারে অতিরিক্ত কোনো উপকার পাওয়া যায় না।

মোটা মানুষই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়

মাত্রাতিরিক্ত ওজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার একটি ঝুঁকি মাত্র, এক্ষেত্রে অন্যান্য ঝুঁকি, যেমন পারিবারিক ইতিহাস, জাতিসত্ত্বা, বয়স, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে, বেশি ওজনই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার একমাত্র ঝুঁকি। অনেক মোটা মানুষেরই ডায়াবেটিস নেই। আবার অনেক ডায়াবেটিক রোগীর ওজন স্বাভাবিক, এমনকি স্বাভাবিকের চেয়েও কম।

ইনসুলিনে কি ব্যথা হয় বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে?

আজকাল যে আধুনিক সিরিঞ্জ বের হয়েছে তাতে ব্যথা হয় না বললেই চলে, আর রোগী যদি ইনসুলিন নেওয়ার ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে খাবার গ্রহণ করেন তবে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

যত ইচ্ছা ফল খাওয়া যেতে পারে

অবশ্যই ফল স্বাস্থ্যকর খাদ্য। এতে আঁশ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও মিনারেল রয়েছে; কিন্তু ফলে শর্করাও থাকে, যাকে অবশ্যই খাদ্যতালিকার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করুন, কোন ফল কত বার, কী পরিমাণে খাবেন।

ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী, টাইপ-১ বা টাইপ-২ কোনো ডায়াবেটিসই চিকিৎসায় সম্পূর্ণ ভালো হয় না। ডায়াবেটিস কোনো নিরাময়যোগ্য রোগ নয়, এটি শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

ইনসুলিন নেয়া শুরু করলে সারা জীবনই দিতে হবে

বিষয়টা আসলে তা নয়। নানা কারণে ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। আবার পরে তা পরিবর্তন করে ওষুধ খাওয়াও যেতে পারে। যেমন গর্ভাবস্থা কেটে যাওয়ার পর বা অস্ত্রোপচারের ঘা শুকিয়ে যাওয়ার পর একসময় ইনসুলিন বন্ধ করে আবার ওষুধ খাওয়া যায়। তবে টাইপ-১ ডায়াবেটিস, কিডনি ও যকৃতের গুরুতর সমস্যা এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার করেও যদি শর্করা নিয়ন্ত্রিত না হয়, এসব ক্ষেত্রে সব সময়ের জন্য ইনসুলিন ব্যবহার করতে হবে।

ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে রোগ

আসল ব্যাপারটি হলো, ডায়াবেটিস কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়। বিশেষ করে জিনগত কারণে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হতে পারে।

প্রচলিত এসব ভুল ধারণায় বিশ্বাস না করে ডায়াবেটিস হতে পারে এমনটা সন্দেহ হওয়া মাত্র চিকিৎসকের পরামর্শে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে নিন। যদি ডায়াবেটিস ধরা পড়ে তাহলে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন প্রণালীর পরিবর্তন, নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মধ্যে থেকে সুস্থ থাকার চেষ্টা করুন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রেখে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবন যাপন করা যায়।

কনসালট্যান্ট ইউরোলজিক্যাল সার্জন

মেজর জেনারেল অধ্যাপক ডাঃ এইচ আর হারুন

এমবিবিএস (ঢাকা), এফসিপিএস (বিডি), এফআরসিএস (গ্লাসগো)
এফআরসিএস (এডিন), এফডব্লিউএইচও (ইউরো), ডি ইউরো (লন্ডন)
প্রাক্তন কনসালট্যান্ট সার্জন জেনারেল ও চিফ ইউরোলজিস্ট
বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস, ঢাকা

চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : সকাল ১০টা - দুপুর ১টা (শুক্রবার ও শনিবার বন্ধ)

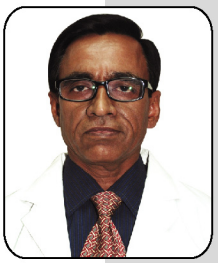

ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ রফিকুল ইসলাম

এমবিবিএস, এফসিপিএস
প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মেডিসিন বিভাগ
শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া

চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : রবি, সোম ও মঙ্গলবার সকাল ৯টা-দুপুর ১টা এবং বিকাল ৫টা- রাত ৯টা

মেডিসিন ও নিউরোমেডিসিন বিশেষজ্ঞ

অধ্যাপক ডাঃ শাহরুখ আহমেদ

এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন)
এমডি (নিউরোলজি)
সিনিয়র কনসালটেন্ট, ল্যাবএইড হাসপাতাল

চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : সকাল ৯টা-রাত ৮টা (শুক্রবার বন্ধ)

চর্ম, যৌন, এলার্জী, লেজার এন্ড হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন

ডাঃ মোঃ কামরুল হাসান চৌধুরী

এমবিবিএস, ডিসিডি, এমএসসি (ক্লিনিক্যাল ডার্মাটোলজি)
কার্ডিফ ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিন (ইউকে)
কনসালটেন্ট, ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

চেম্বার : ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল
সময় : সকাল ১০টা - দুপুর ১টা এবং বিকাল ৫টা-রাত ৯টা (শুক্রবার বন্ধ)

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
২৪
সোমবার
২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২২
০৭ ডিসেম্বর ২০১৫
প্রজন্ম

ডা. এ এম শামীম
বদলে দেওয়া একজন

● রিয়াদ খন্দকার

ভাগ্য বদলে নয়, কর্মে বিশ্বাসী একজন মানুষ। কখনো প্রাচুর্যের মধ্যে যেমন বড় হননি, তেমনি অসচ্ছলতাও তাকে স্পর্শ করেনি। দুই বোন, এক ভাই–সবাই পড়াশোনায় বেশ মেধাবী ছিলেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠেও তাদের স্বপ্ন ছিল আকাশ ছোঁয়ার। পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতাটা ছিল বরাবরই মাঝামাঝি–চাইলেই একটা ফুটবল কেনার চিন্তাটা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল দুরূহ, পাড়াতে কয়েকজন বন্ধু মিলে দুই টাকা চাঁদা দিয়ে হয়তো একটা ফুটবল কেনা হতো; আবার স্কুলে যাওয়ার পথে বাবার অফিসের গাড়িটি যদি ভাগ্যক্রমে কখনো পেতেন তাহলে তো ভালোই; না হলে কয়েকজন বন্ধু মিলে হেঁটেই রওনা হতেন স্কুলের দিকে। তবে সবকিছু ছাপিয়ে জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল, গতানুগতিক চিন্তা থেকে বেরিয়ে নতুন কিছু করার। বলছিলাম, ল্যাবএইড গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডা. এ এম শামীমের কথা। যিনি চলতি জীবনের অলিগলি থেকেই খুঁজে ফেরেন নিজের কাজের স্পৃহা এবং নতুন উদ্যোগের প্রেরণা।

ডা. শামীম ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। জীবনে যা-ই পেয়েছেন নিজের যোগ্যতা ও কর্মের মাধ্যমে। তার মতে, এই প্রজন্মের মধ্যে এই স্পৃহাটা থাকা উচিত। চাইতেই কোনো কিছু না পাওয়ার চেয়ে ধৈর্য ধারণের অভ্যাস থাকা উচিত। এতে জীবনের ধারাবাহিকতায় একটি বড় গল্প নিয়ে আসে। কেননা তিনি নিজেই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। কুমিল্লাতে জন্ম হলেও বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে বেশ কয়েকটি জেলায় শৈশবের দিনগুলো কেটেছে ডা. শামীমের। ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, সিলেট জেলা স্কুল, কুমিল্লা জেলা স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজে কেটেছে তার পড়াশোনার প্রথম ভাগ। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের পড়াশোনা শেষে তিনি লিভারপুল থেকে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের উপর একটি ডিপ্লোমা করেন। এরপর বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রেডিওলোজির উপর একটা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনও করা হয় তার।

এমবিবিএস শেষ করার পর সরকারি চাকরিতে যোগদানে তার প্রথম পোস্টিং পরে টুঙ্গিপাড়ায়। জুনে কোনো এক বৃষ্টিমুখর রাতে পৌঁছান টুঙ্গিপাড়ায়, পথিমধ্যেই যেতে চোখে পড়ল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছার কবর, খুব সাধারণ ছোট দুটি হলুদ কবর, পাশে একটি দুতলা বাড়ি। এত বড়মাপের একজন মানুষ শুয়ে আছেন এমন অনাদর অবহেলায়, মনটা হু-হু করে উঠে তার। টুঙ্গিপাড়ার অজোপাড়া গাঁয়ে একটি মেসের মতো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা হলো। রাত তখন ১টা, হাসপাতাল থেকে একজন পিয়ন এসে বলল, 'একজন রোগী আসছে তার বাচ্চা হবে কিন্তু বাচ্চাটা আটকানো, যেতে হবে।' তৈরি হয়ে রওনা দিলেন, গিয়ে দেখলেন নদীর ধারে শাড়ি দিয়ে মোড়ানো একটা ছইওয়ালা নৌকায় মহিলা কান্নাকাটি করছেন। সঙ্গে একজন দাই নিয়ে তিনি নৌকায় উঠলেন দেখলেন বাচ্চাটির পা বেরিয়ে গেছে বাকি শরীরটা বের হতে পারছে না, এখন ১০ মিনিটের মধ্যে বাচ্চাটিকে সম্পূর্ণ না বের করলে বাঁচানো সম্ভব না। এতদিনের মোটা মোটা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইয়ের পড়া এই প্রথম বাস্তবতায় রূপ নিলো, এবং সার্থকতাপেল যখন বাচ্চাটির সুস্থ ডেলিভারি সম্পন্ন হলো। এমনই ছিল ডা. শামীমের চিকিৎসা পেশার প্রথম অভিজ্ঞতা। পরের দিন সকালে ওই বাচ্চার আত্মীয় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ২৪-২৫টা হাঁসের ডিম উপহার দেয় তাকে। বছরখানেক এখানে চাকরির পাশাপাশি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের পড়াশোনাও করতে থাকেন। তখনই একটি ব্রিটিশ স্কলারশিপ পান তিনি, যার আর্থিক মূল্য সে সময়ের দশ হাজার পাউন্ড। সেই স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যান লিভারপুলে।

ডা. শামীম জীবনের সব কাজই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করেছেন। তিনি যখন ডাক্তার ছিলেন, সেই সময় ঢাকার যোগাযোগব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। একজন রোগীকে ২-৩টাপরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যেতে হতো আলাদা আলাদা জায়গায়। বিশেষ করে যে রোগীরা ঢাকার বাইরে থেকে আসতেন তাদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেকটাই ব্যয়বহুল এবং একই সাথে বিশাল ভোগান্তির কারণও ছিল। এই অবস্থা দেখে ডা. শামীম চিন্তা করলেন, যদি কোনোভাবে এসব পরীক্ষার ব্যবস্থা একসাথে করা যায় তাহলে বহু মানুষের সময় ও কষ্ট দুটোই লাঘব হবে। সেই চেষ্টা থেকেই প্রথম ব্রেন ডায়াগনস্টিক সেন্টার খুললেন তার বন্ধুদের সাথে। তারপর তিনি চলে যান পড়ার জন্য দেশের বাইরে। এর মাঝে তার বন্ধুরাও একে একে দেশের বাইরে চলে যান পড়তে। তিনি দেশে ফিরে এসে হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক ল্যাব ও ফার্মেসির সমন্বয়ে শুরু করেন ল্যাবএইড হাসপাতালের কার্যক্রম। দেশে সর্বপ্রথম একই সাথে একই ছাতার নিচে ৩ ধরনের স্বাস্থ্যসেবা অথবা বলা চলে একই সাথে সর্বপ্রকার স্বাস্থ্যসুবিধা।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর তিনি চাকরি ছেড়ে ল্যাবএইডেই ফুলটাইম কাজ করা শুরু করেন। কাজ করতে দিয়ে তিনি অনুধাবন করেন তার ল্যাবের রিপোর্টগুলো মানসম্মত হচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে তিনি খুঁজে বের করেন দক্ষ প্যাথলজিস্টের অভাব। সেই সমস্যার সমাধান করতেই তিনি গড়ে তোলেন 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল টেকনোলজি', সেই সময়ে তার এই উদ্যোগ অনেকটা বিপ-বএনে দেয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে।

নিজের কর্মক্ষেত্র যখন দিনকে দিন বৃদ্ধি হচ্ছিল এমনই সময়ে তার বাবা অসুস্থ হয়ে পরলেন। ডা. শামীম বাবাকে ভর্তি করালেন ঢাকার একটি হাসপাতালে। কিছুদিন নিজেই দেশের বাইরে থেকে ইসিজি মেশিন এনে চেক করেন এবং দেখেন তার বাবার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, যা শুধু মেশিনের অভাবে ধরা পড়েনি। সেই মুহূর্তে তিনি অনুভব করলেন, এই দেশে অনেক ডাক্তার আছে, হাসপাতাল আছে কিন্তু রোগ নির্ণয়ের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নতির সব প্রচেষ্টা বিফলে যাচ্ছে। তারপর ২০০৪ সালে তিনি শুরু করেন কার্ডিয়াক হাসপাতালের কাজ। এ বছরেই হাসপাতালের কাজ সম্পন্ন হয়।

ইংল্যান্ডে গিয়ে ডা. শামীম দেখলেন দেশের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাবে দেশের বাইরে পড়তে যাচ্ছে। নিজের দেশের সম্পদ এভাবে হাতছাড়া করতে মন টানল না তার। সেই চিন্তা থেকে যাত্রা শুরু শুরু করলেন স্টেট ইউনিভার্সিটির। এছাড়াও তার রয়েছে 'স্টেট কলেজ অব হেলথ সায়েন্স' যেখানে নার্সদের ডিপ্লোমার বদলে সম্পূর্ণ গ্র্যাজুয়েশন করানো হয়।

বাংলাদেশের মানুষ একই সাথে যেমন ভালো স্বাস্থ্যসেবা চায়, তেমনি চায় ভালো পরিবেশ। সেই প্রয়োজন থেকেই বারিধারায় ডা. শামীম গড়ে তুলছেন সম্পূর্ণ আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্বলিত হাসপাতাল। এত সাফল্যের পরেও কিন্তু তিনি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা ভুলে যাননি। ঢাকার অদূরেই নারায়ণগঞ্জে ৩ একর জমির উপর একটি হাসপাতাল গড়ে তুলছেন, যেখানে সুবিধাবঞ্চিতদের চিকিত্সা দেওয়া হবে। এছাড়াও খুব শিগগিরই ক্যান্সার হাসপাতালের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই মানুষটি মনে করেন তার সাফল্য অন্যদের মাঝে প্রতিযোগিতা তৈরি করবে। আর ইতিবাচক কাজে প্রতিযোগিতা হলে মানের সমতা যেমন বজায় থাকে, তেমনি দেশের স্বাস্থ্যসেবার মানও উর্ধ্বগামী হয়। তিনি বিশ্বাস করেন, যেখানে ব্যথা সেখানেই হাত দিতে হয়। সারাজীবন তিনি মানুষের কষ্ট থেকে শিখেছেন এবং সেই শিক্ষাগুলো থেকেই গড়ে তুলেছেন অনন্য সব উদ্যোগ। তাই এই প্রতিভাবানকে কখনো পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃত তিনি। ভবিষ্যতে দেশের জন্য আরও কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে তার। তার কাছে জীবন একটি চ্যালেঞ্জ এবং সবার কাছেও তা-ই হওয়া উচিত। ডা. শামীম এই প্রজন্মের কাছে প্রত্যাশা করেন, সবাই যেন নিজেদের উপর আস্থা রাখে এবং 'আমিও পারি' এমন মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের পথে। প্রজন্মের পক্ষ থেকে খুবই সাধারণ কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবান এই মানুষটির জন্য শুভকামনা।

ছবি: সোহেল মামুন

জীবনের জন্য শিল্প

কী সুন্দর ফুটে আছে ফুল। এই তো, সমুদ্রের জগৎ হলো উন্মোচিত। বাহারি রঙের নৌকাও তো দেখা যায়। সমুদ্র, নদী, ঝরনাধারা, বিল, নীলিমার খেলা, পাহাড়, বৃক্ষ, সবুজের রাশি-পুরোপ্রকৃতিই যেন উঠে এসেছে জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী কক্ষ ও প্রধান মিলনায়তনের বাইরের লবিতে।
না, বিভ্রান্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সেখানে আয়োজিত হয়েছিল একটি চিত্র প্রদর্শনী 'জীবনের জন্য শিল্প'।
ল্যাবএইড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. এ এম শামীম জানান, 'ল্যাবএইড ২০০৯-এ দুটি ও ২০১৫-তে তিনটি আর্ট ক্যাম্প করে। উদ্দেশ্য ছিল ল্যাবএইড হাসপাতালে আসা রোগী এবং তার স্বজনদের একটু স্বস্তি দেওয়া। এ জন্য সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, মেঘনা নদী ও বান্দরবানে নিয়ে গিয়ে শিল্পীদের বলা হয়েছিল, তাঁরা যেন নিসর্গের ছবিই আঁকেন। ছবি দেখে মুমূর্ষু জীবন যেন একটু শান্তির খুঁজে পায়।' হাসপাতালের বিভিন্ন দেয়ালে ছবিগুলো ছিল এত দিন। সেখান থেকে ২০০টি ছবি নিয়ে এখন আয়োজিত হলো এ প্রদর্শনী। ৫৭ জন শিল্পী এঁকেছেন এসব ছবি।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে নৃত্যদল 'সাধনা' পরিবেশন করে একটি নাচ। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, ছবি যেন শান্তিরই প্রতিকৃতি। এখন এই অস্থির সময়ে সব জায়গায় ছবিরূপে শান্তি দাঁড়িয়ে পড়ুক, যেন অস্থির মানুষগুলো শান্ত হতে পারে। প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, শিল্পপ্রেমিক কখনো ঝগড়া পছন্দ করতে পারে না, কখনো যুদ্ধপ্রেমী হতে পারে না। তাই মানুষের রুচির উন্নতির জন্যই শিল্পচর্চা প্রয়োজন।

গত ১৮ ডিসেম্বর (শুক্রবার) ২০১৫ইং তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর শাহবাগে ল্যাবএইড ফাউন্ডেশনের আয়োজনে 'জীবনের জন্য শিল্প' শিরোনামে ৬ দিনব্যাপী এক চিত্র প্রদর্শনীর চলে।
১৮-২৩ ডিসেম্বর ৬ দিনব্যাপী এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ল্যাবএইড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাঃ এ এম শামীম। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা

অনুষদের সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান।
দেশের ৫৭ জন প্রথিতযসা শিল্পীর ২০০টি চিত্রকর্ম নিয়ে ল্যাবএইড ফাউন্ডেশনের এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোগ। প্রদর্শনীর সবগুলো চিত্রকর্ম বিভিন্ন সময়ে ল্যাবএইড আয়োজিত আর্ট ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ল্যাবএইড তিনটি আর্ট ক্যাম্পের আয়োজন করে। প্রথম আর্ট ক্যাম্পটির আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে ২০০৯ সালের (৯-১১) জানুয়ারিতে। প্রবীন ও নবীন শিল্পীদের সমন্বয়ে এই আর্ট ক্যাম্পের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দ্বিতীয় আর্ট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় একই বছরের (১১-১২) মার্চ মাসে। এই ক্যাম্পটির আয়োজন করা হয় মেঘনা নদীতে। তৃতীয় আর্ট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় ২০১৫ সালের (৭-১১) মে মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে।
দেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে ল্যাবএইড কাজ করে যাচ্ছে। আর্ট ক্যাম্পগুলোতে বিখ্যাত প্রবীন শিল্পীদের পাশাপাশি নবীন শিল্পীরাও অংশ গ্রহন করেছিলেন। তাদের সবার কাছ থেকে সংগৃহিত চিত্রকর্মগুলো ল্যাবএইড হাসপাতালের বিভিন্ন দেয়ালে সারা বছর প্রদর্শিত হয়। যা প্রতিদিন হাসপাতালে আগত দুই থেতে তিন হাজার মানুষের সহজেই নজরে আসে।
এই চিত্রকর্মগুলোকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিতেই ল্যাবএইড ফাউন্ডেশনের এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোগ। 'জীবনের জন্য শিল্প' এই উদ্যোগ ল্যাবএইডের বিশ্বাস আর মূল্যবোধেরই বহিঃ প্রকাশ।

হটলাইন | ০১৮৪৪১১০০৪

ল্যাবএইড
এখন ময়মনসিংহে

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ

প্রফেসর. এ.এফ.এম. সিদ্দিকুর রহমান
এমবিবিএস, এফসিপিএস (পাক), এফসিপিএস (বিডি), এফএসিপি (ইউএসএ), এফআরসিপি (এডিন) ইউকে

ডাঃ মোঃ আব্দুল হান্নান মিয়া
এমবিবিএস, বিসিএস, এমডি (মেডিসিন) সহকারী অধ্যাপক এমএমসিএইচ

ডাঃ বিলাস রঞ্জন দাস
এমবিবিএস, বিসিএস, এমডি (মেডিসিন), এমএমসিএইচ

ডাঃ কোহিনুর আক্তার
এমবিবিএস, বিসিএস, ডিজিও (ডিইউ), সহযোগী অধ্যাপক এমএমসিএইচ

ডাঃ শামসুন নাহার (ফ্লোরা)
এমবিবিএস, বিসিএস, ডিজিও (ডিএমসি), এফসিপিএস (গাইনি ও অবস) এমএমসিএইচ

ডাঃ শিমলা আফতাব শাওন
এমবিবিএস, বিসিএস, এফসিপিএস (গাইনি ও অবস), এমএমসিএইচ

ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম
এমবিবিএস, এমডি (কার্ড) সহকারী অধ্যাপক (কার্ডিওলজি), এমএমসিএইচ

ডাঃ আর. সি. দেবনাথ
এমবিবিএস, ডিটিসিডি (এনআইডিসিএইচ), এমডি (কার্ডিওলজি) সহকারী অধ্যাপক এমএমসিএইচ

ডাঃ আশীষ কুমার রায়
এমবিবিএস, এমডি (কার্ডিওলজি), কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি), এমএমসিএইচ

ডাঃ চিত্তরঞ্জন দেবনাথ
এমবিবিএস, এমসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (হেপাটোলজি), এফআরসিপি (এডিন), সহযোগী অধ্যাপক, এমএমসিএইচ

ডাঃ উত্তম কুমার সরকার
এমবিবিএস, বিসিএস, এমডি (নিউরোমেডিসিন), রেজিস্টার (নিউরোলজি), এমএমসিএইচ

প্রফেসর ডাঃ মৃনাল কান্তি রায়
এমবিবিএস, এফসিপিএস (সার্জারি) এমএস (ইউরোলজি), এক্স প্রফেসর এমএমসিএইচ

ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম (শামীম)
এমবিবিএস, এমএস (ইউরোলজি), এমএমসিএইচ

ডাঃ মোহাম্মদ তারিকুল আলম (নোমান)
এমবিবিএস, বিসিএস, এমএস (অর্থো), কনসালটেন্ট (অর্থো সার্জারি), এমএমসিএইচ

ডাঃ মোঃ শাহিনুল ইসলাম (শাহিন)
এমবিবিএস, বিসিএস, এমএস (অর্থো), নিটোর

ডাঃ অসীম কুমার নন্দি
এমবিবিএস, ডিডিভি (ডিইউ) সহকারী অধ্যাপক, এমএমসিএইচ

ডাঃ শাকের আহমেদ
এমবিবিএস, বিসিএস, এফসিপিএস (ইএনটি) সহকারী অধ্যাপক, এমএমসিএইচ

ডাঃ এ. বি. এম কামরুল হাসান
এমবিবিএস (এসএসএমসি), বিসিএস, এমডি (এন্ডোক্রাইনোলজি এন্ড মেটাবোলিজম), এমএমসিএইচ

ডাঃ মোঃ দেলোয়ার জাহান খান
এমবিবিএস, বিসিএস, ডিটিসিডি (বিএসএমএমইউ), এমএমসিএইচ

অধ্যাপক, ডাঃ মোঃ আশরাফ উদ্দিন
এমবিবিএস, এফসিপিএস (সার্জারি) অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান,এমএমসিএইচ

ডাঃ মোঃ আজিম উদ্দিন হিরা
এমবিবিএস, বিসিএস, এফসিপিএস (সার্জারি) রেজিস্টার (সার্জারি), এমএমসিএইচ

ডাঃ বিশ্বজিত চৌধুরী
এমবিবিএস, বিসিএস, এমডি (শিশু) (আরপি), এমএমসিএইচ

ডাঃ মোঃ শফিকুল বারী (তুহিন)
এমবিবিএস, বিসিএস, এমএস (পেডিয়াট্রিক সার্জন), এমএমসিএইচ

ডাঃ আশুতোষ সাহা রায়
এমবিবিএস, বিসিএস, এমডি (নেফ্রোলজি) সহকারী অধ্যাপক এমএমসিএইচ

ডাঃ কাজী শরিফুল ইসলাম
এমবিবিএস, এমএস (সিভি এন্ড টিএস) সহযোগি অধ্যাপক এনআইসিভিডি

ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান (তারেক)
এমবিবিএস, ডিসিপি (প্যাথ), এফসিপিএস (হেমাটোলজি) সহযোগী অধ্যাপক, এমএমসিএইচ

মেডিকেল চেক-আপ

ঝুঁকিপূর্ণ রোগ যেমন হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি কখনো কখনো কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ ছাড়াই দেহের অভ্যন্তরে বাসা বাধে, যা আপনার দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে; এমনকি ঠেলে দিতে পারে অকাল মৃত্যুর দিকে! তাই প্রতিটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের উচিত নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে নিজের সুস্থতা নিশ্চিত করা। সুস্থ থাকলেও বছরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা জরুরি। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 'ল্যাবএইড ডায়াগনস্টিক, ময়মনসিংহ' এখন আপনার শহরে।

যোগাযোগ ৭২, চরপাড়া, মেডিকেল কলেজ গেট, ময়মনসিংহ।

[HOTLINE : 10606]

ব্রেস্ট ক্যান্সার নির্ণয়ে

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি

এখন ল্যাবএইডে

গ্লোবোকন ২০১২-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ক্যান্সার আক্রান্ত নারীদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি এবং এই ক্যান্সারে মৃত্যুর হারও সবচেয়ে বেশি। প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ১৫ হাজার নারী ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এবং প্রায় ৭ হাজার নারী এই ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্রেস্ট ক্যান্সারের লক্ষণ সনাক্ত করা গেলে এই ক্যান্সার নিরাময়ের সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

ল্যাবএইড ব্রেস্ট ক্যান্সার নিরাময়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই প্রচেস্টার অংশ হিসাবে আমরা এনেছি অত্যাধুনিক **"Amulet Innovality" 3D Mammography Machine,** অন্যান্য প্রচলিত মেশিনের তুলনায় ব্রেস্ট ক্যান্সারের লক্ষণগুলো সঠিকভাবে সনাক্ত করতে এই মেশিন অনেক বেশি কার্যকর। ফলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষুদ্রতম লক্ষণগুলোও অনেক আগেই সনাক্ত করা যায়।

• বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন : **017 6666 3333**

LABAID SPECIALIZED HOSPITAL
Care First...

ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

বাড়ি ৬, রোড ৪, ধানমন্ডি, ঢাকা, ফোন : ৯৬৭৬৩৫৬, ৫৮৬১০৭৯৩-৮
ওয়েব : www.labaidgroup.com, ই-মেইল : info@labaidgroup.com